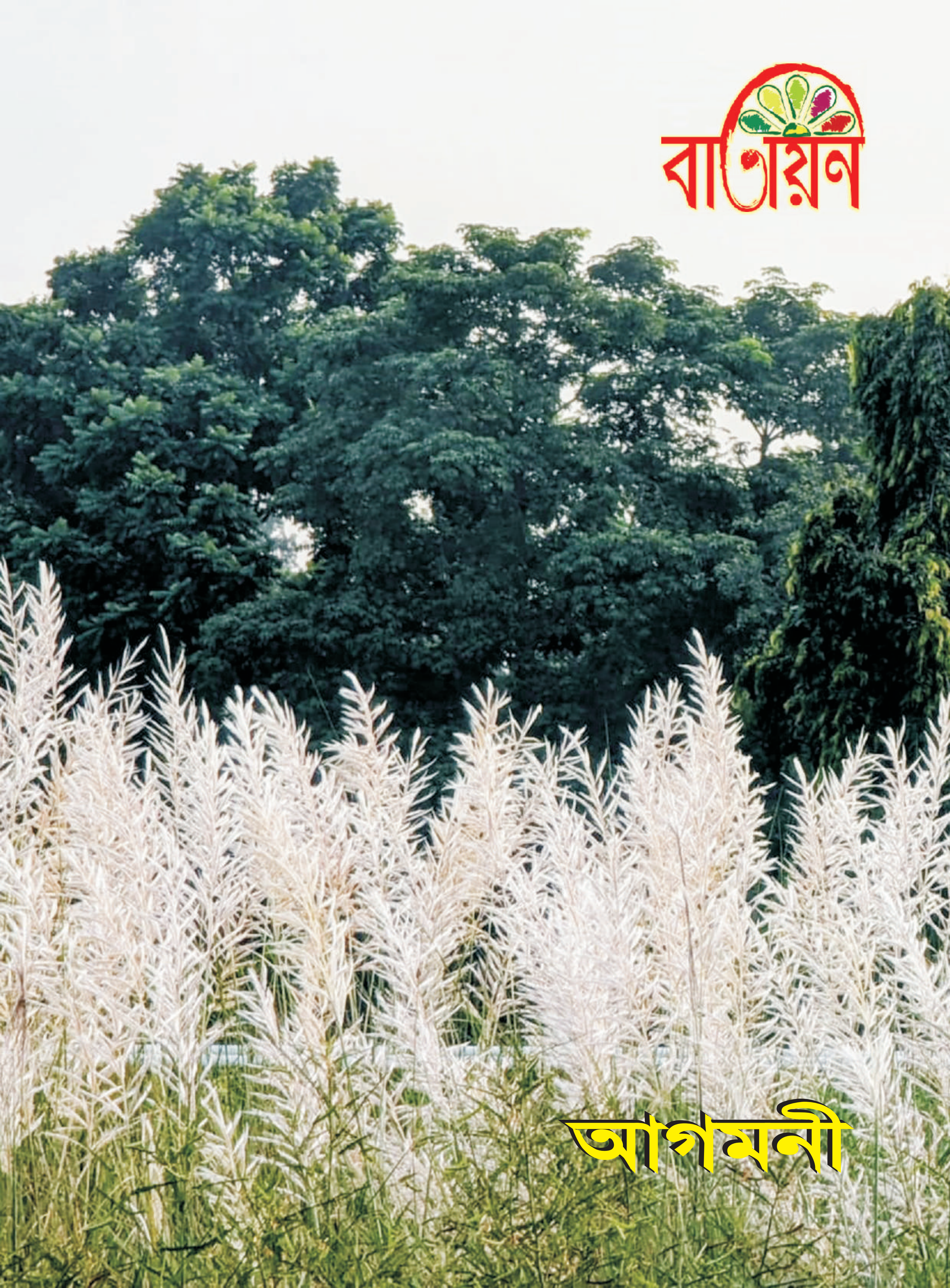
বাতায়ন
আগমনী

From
Ray to Ray

– a legacy unfolds:

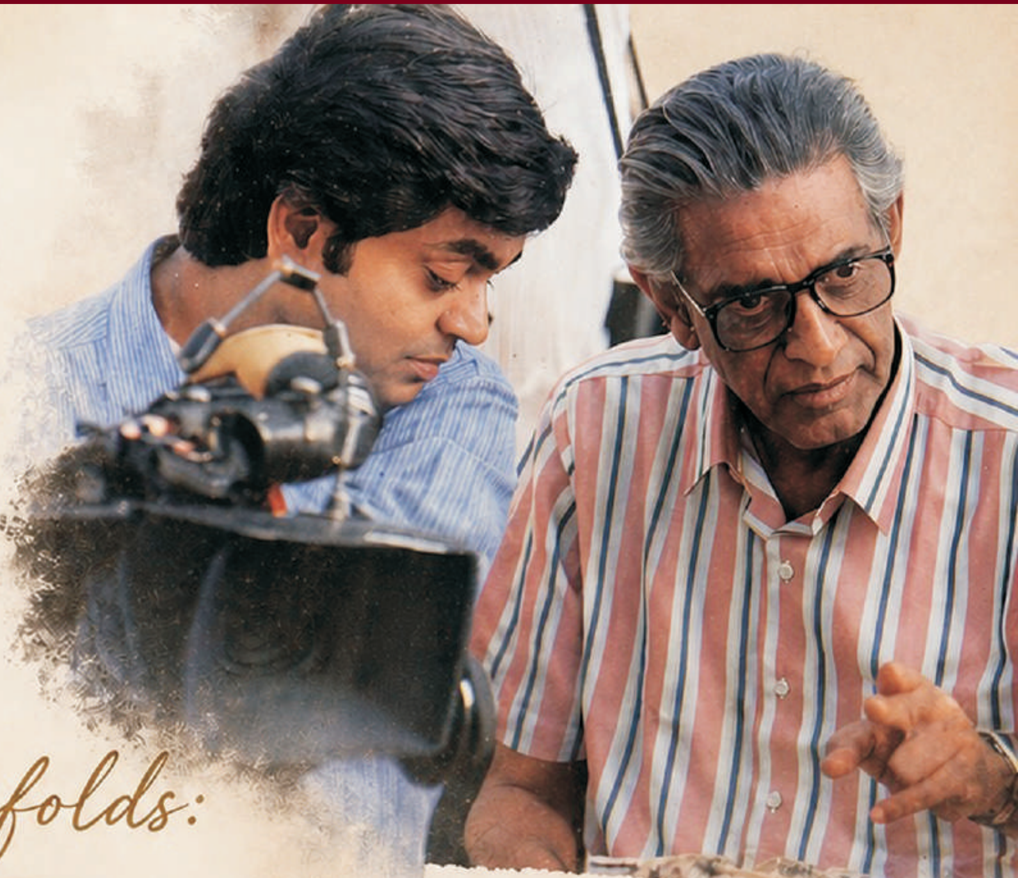

Sunday, 17 May | 2:00 PM – 4:00 PM | Kim Beazley Lecture Theatre

One Afternoon - One StoryTeller - A Lifetime of Cinema:

Sandip Ray
in Perth.

Batayan

“দেখিতে পেলুম চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ’তে সাড়ে পাঁচ পা ফেলিয়া
ঘাসের কোমল আসনে বসানো বারোটি শিশিরবিন্দু
সবুজ সজীব
প্রাণের মুকুতা
জীবন করুণাসিন্ধু ।। ”

– সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

Chief Editor:
Ranjita Chattopadhyay

Issue No. 37 | August, 2026

A literary magazine with an International reach

Issue No. 37 | August, 2026

ISBN: 978-1-7641232-6-6

Chief Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chairman & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
neospectrum58@gmail.com

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Ajit Sen — **Front Cover, Back Inside & Back Cover**

Ajit Sen is an engineer & Tea technologist based in Kolkata having 51 years of working experience in growing, manufacturing, blending, packaging & marketing of tea in India & worldwide.

His passion is Photography, Golf and Oriental cooking, who believes every colour in food is a Vitamin & unique nutrient. Eat multiple colours & variety food to live healthy.

For more on Tea you can reach him at ajitksen@outlook.com

Supratik Mukherjee — **Title Page**

সুপ্রতীক মুখার্জী। পার্থিব বাসিন্দা। প্রজ্ঞা-পিয়াসি।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

Duck Family	Sunanda Sinha Bose	7
অনন্ত বৃত্তের আলোকরেখা	সুপর্ণা চ্যাটার্জী	10
পাগলি ফিরে আয়	অমৃতা মুখার্জি	12
লিমেরিক	শুভ্র দত্ত	13
সত্যের অপচয়	ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়	14
বাইশে শ্রাবণ	তপনজ্যোতি মিত্র	15
ঘোড়ার জাত	বালার্ক ব্যানার্জী	16
রাগ বসন্ত	আর্যা ভট্টাচার্য	17
যুবতী কাকলি	মলি সিদ্দিকা	18
ওপাশ – এপাশঃ	নরসিংহ কাশ্যপ	19
অপেক্ষা	সুনন্দা সিনহা বোস	20
কল্পবৃক্ষ	লক্ষ্মী কঁচী	21
এক ভোরের পথ - নীল পাহাড়ের ডাকে	ঊর্মি চক্রবর্তী	23
শতবর্ষে রুট ৬৬	অঞ্জন রায়	27
ইয়েটস – কবি হয়ে ওঠার কাহিনী	দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত	30
সেই ছেলেটা	সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	32
অক্টোপাসের আত্মরক্ষা	রাহুল রায়	37
মিমো ফার্স্ট হবেনা	সৌমিত্র চক্রবর্তী	47

ভুল	সুজয় দত্ত	50
বাঁদরওলা	সুভাষ রায়	52
বাদল সরকার, ব্যাঙ্গালোর এবং আমি	জয় মুখোপাধ্যায়	53
ভাস্কো দা গামার দেশে	শুভ্র দাস	56
বাংলার বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী – কে. এস. কৃষ্ণণ	শেখর গুহ	66
পাঠক প্রতিক্রিয়া	সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	75

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাতায়ন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যটি ঠিক কবে, কখন বা কোথায় শুরু হয়েছিল একথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এ ঐতিহ্যটি যে সুপ্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আলতামিরার গুহাচিত্রের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। গুহার দেওয়ালে নানাবিধ চিত্র ফুটিয়ে তোলার আড়ালে শিল্পীদের কি ভাবনা ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। হয়তো চারপাশের জগৎটি যেভাবে আবিষ্কার করছেন অন্যান্য গুহামানবদের সেকথা জানাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। আর তা থেকেই সেই চিত্রকলার জন্ম। নিজের বোধ আর অনুভূতিকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই তাগিদই হয়তো সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির গভীরে আছে।

যাঁরা শব্দশিল্পী তাঁরা ভাষার মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে চলেন। ছবি আঁকেন শব্দ দিয়ে। আমাদের আশেপাশে জীবনের বহতা স্রোত। সেই স্রোত সাহিত্যিকদের চোখে যেভাবে ধরা দেয় তা তাঁরা নিজেদের অনুভূতির রসে জারিত করে একটি ছবি আঁকেন। আর সেই ছবিই কখনও হয়ে ওঠে গল্প, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ বা নাটক। ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে ভাষা ভিন্ন। আর ভাষা ভেদে শব্দাবলীও ভিন্ন। তবে পৃথিবীর যেকোন ভাষাতেই সাহিত্যসৃষ্টির মূল কথাটি হল শব্দ গেঁথে মালা তৈরী করা। দেশ ভেদে যেমন বদলে যায় ভাষা, তেমনই একই ভাষাও আবার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হতে চলে।

ভাষার মজাটাই হল এমন। রূপান্তর হতে হতে কোথায় পৌঁছয় তা আগে থেকে জানা বোঝার কোন উপায় নেই। চর্যাপদের ‘সন্ধ্যাভাষা” বাংলাভাষার আদিরূপ – এমনটাই পাওয়া যায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের বইগুলিতে। তারপর নানা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাভাষা। কিন্তু ভাষার বিবর্তন তো কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেমে নেই। প্রতিমুহূর্তেই হচ্ছে তার রূপবদল। তাই যেটাকে আজকের বাংলাভাষা বলে মনে করা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তা বিগত দিনের বলে মনে হতে পারে। তবে এই চলমানতাই জীবনের লক্ষণ।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে পৃথিবী যেন অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে। বেড়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত ও চিন্তা ভাবনার বিনিময়। বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। যেখানেই সে গেছে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার নিজের ভাষাটি। অন্য সংস্কৃতির জমিতে যত্নে রোপণ করেছে মাতৃভাষার চারাগাছ। ভিনদেশী মাটি থেকে পুষ্টি আহরণ করে ফুলেফলে পল্লবিত বাংলাভাষা গাছ দাঁড়িয়ে আছে আজ লণ্ডনে, প্যারিসে, শিকাগোতে বা সিডনিতে। যে জলহাওয়ায় তার মূলে একদা রসসিঞ্চন করেছিল সেখান থেকে বহুদূরে গিয়ে যখন অঙ্কুরিত হল সেই গাছ, তার পাতার বিন্যাস আর ফুলের শোভা একইরকম রইল না কিন্তু। ভাষার এই নবকলেবর যে কেমন হবে আগে থেকে সে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই কারও।

আর তা না জেনেও নিয়মিত গাছে শিকড়ে জল দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাওয়াটাই হল ‘বাতায়ন’ পত্রিকার প্রতিশ্রুতি। আজকাল প্রায়ই একটা আক্ষেপ শোনা যায়। তা হল বাংলার ভাষা অপুষ্টিতে ভুগছে। তার এখন নাকি রুগ্নদশা !

“ভাষা গাছ থেকে ক্রমে শব্দ-পাতারা ঝরে যায়
নিছকই নিঃশব্দে, প্রথমে গাঢ় অভিমানে
কিছুটা হলদে রঙা হলে, হেমন্ত এসেছে ভেবে
লোকে উৎসবে মেতে উঠেছিল।”

– ভাষা -গাছ /সুমন মান্না

হলদে রঙা সেইসব পাতারা শুধু যে হৈমন্তিক উৎসবেরই দ্যোতক তা নয়। অবহেলায় ঝরেও যায় তারা সহজে। পাতাদের ঝরে যাওয়া থেকে বাঁচাতে ভাষা গাছের গোড়ায় জলসিঞ্চন প্রয়োজন। বাংলা ভাষারূপী গাছ, যে গাছ আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে বহু গান, গল্প আর কবিতা, যে গাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার মানুষ, সে গাছ পরিচর্যা চায় আজ।

'বাতায়ন' সাহিত্যগোষ্ঠীর ভূমিকা বাংলা ভাষা-গাছের পরিচর্যাকারীর। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। গত এক দশক ধরে 'বাতায়ন' নিজের মতো করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার একটা পরিসর তৈরী করার কাজে রত। সেই পরিসর দিনে দিনে প্রশস্ত হয়েছে বন্ধুদের সহযোগিতায়, ভালবাসায়। আমাদের আঙিনায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের বাংলা সাহিত্যপ্রেমীদের আনাগোনা আজ। তাঁদের সকলকে স্বাগত। লেখা, লেখা নিয়ে নানা ভাবনা, সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা – এক কথায় সাহিত্য নিয়ে মূলত প্রবাসী লেখক ও পাঠকদের ভাব বিনিময়ের একটা সুযোগ 'বাতায়ন' পত্রিকা/সাহিত্যগোষ্ঠী যে দিতে পেরেছে এবং পারছে সেটাই আনন্দের বিষয়। পত্রিকার শুরুর সেই দিনগুলোতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল শুধু। সেইসঙ্গে অনিশ্চয়তাও ছিল। কিন্তু স্বপ্ন দেখা আমরা ছাড়ি নি। প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 'বাতায়ন' আজ নিজস্ব একটা জায়গা করে নিয়েছে।

পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি প্রবাসে বাঙালী সাহিত্যিকদের কাজ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস ছোট করে হলেও চালিয়ে যাচ্ছে বাতায়ন। বইমেলাতে বাতায়নের স্টলে প্রবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চাকারীদের মেলামেশা ও আড্ডার একটা পরিসর তৈরী হয়। বিগত দশ বছরে একাধিকবার Center For Stories, PEN Perth ও বাতায়নের এর যৌথ উদ্যোগে কবি শ্রীজাত, তন্ময় চক্রবর্তী তাঁদের কবিতা ও কবিতাভাবনা তুলে ধরেছেন বিদেশী পাঠকদের কাছে। West Australian Poets ও বাতায়ন যৌথভাবে নিবেদন করেছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের নাম হল Bard Of Bengal. এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত লেখার পাঠ ও গান পৌঁছে গেছে অ-বাংলাভাষী শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে। এরই পাশাপাশি বাতায়নের উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতা কর্মশালা। নিঃসন্দেহে এসবই প্রবাসে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ। সম্প্রতি বাংলার শেষ রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ব বলে আমরা যাঁকে জানি, সেই সত্যজিৎ রায় ও রায় পরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হল পার্থ শহরে। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সত্যজিৎ তনয় সন্দীপ রায়ের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে বাতায়নের একটি বিশেষ সংখ্যা, 'রায়বাড়ি।'

আজকের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, যেখানে content তৈরী করতে বা মুছে ফেলতে সময় লাগে কয়েক মিনিট মাত্র, সেখানে লেখালেখির প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত একটা উদ্যোগ দশ-দশটি বছর ধরে চালানো একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। 'বাতায়ন' পত্রিকাগোষ্ঠী শুধু যে সেই উদ্যোগ ধরে রেখেছে তা নয়, বিস্তার ঘটছে পত্রিকার কর্মসূচির। যেকথা বারেবারেই বলতে হয় তা হল বাতায়নের শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতা ছাড়া একাজ সম্ভব হত না মোটেও। তাঁদের জন্য আমাদের অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসা রইল।

শুভেচ্ছান্তে,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
শিকাগো, ইলিনয়
চিফ এডিটর – বাতায়ন পত্রিকা

Sunanda Sinha Bose

Duck Family

Sunanda Sinha Bose – living in the USA for the past 42 years. Taught ESL and English at a Community College. After retirement teaching as a volunteer, writing, painting and pursuing Indian classical music keeps her busy. I started the literary organization Unmesh 33 years ago in Chicago.

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে – সন্দীপ রায় ও ললিতা রায়

বাতায়ন ও রঙ্গমঞ্চ, অস্ট্রেলিয়ার Perth শহরের দুটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাদের উদ্যোগে Murdoch Universityর অডিটোরিয়ামে "সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ" শীর্ষক অনুষ্ঠানে Perthএর মানুষদের এক মনোজ্ঞ কথালাপ অনুষ্ঠিত হলো রবিবার, ১৭ মে ২০২৬ দ্বিপ্রহরে। সন্দীপ রায় সত্যজিতের সৃষ্টির দুনিয়ায় শ্রোতাদের নিয়ে গেলেন, কথায় ও ছবিতে তুলে ধরলেন তাঁর কর্মকৃতি। কলম ও ক্যামেরায় ধরে রাখা তাঁর বহু বিচিত্র কাজের মুখোমুখি হলেন উপস্থিত মানুষ জন। ছিলেন ভারতের বাঙালি কনসাল জেনারেল, জনপ্রতিনিধিরা ও স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরাও। সন্দীপবাবু, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মজলিশি ভঙ্গিতে, বিধৃত করলেন সত্যজিতের কাজ। বাতায়ন পত্রিকার "সত্যজিৎ রায় সংখ্যা"র উদ্বোধনও করলেন তিনি। এর আগের দিন, শনিবার, ১৬ মে ২০২৬, রঙ্গমঞ্চ গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন হীরক রাজার দেশের নাট্যরূপ। সুচারু অভিনয়ে ছিলেন একদল কচিকাঁচা। তারা আদায় করে নিলো সন্দীপ রায় ও বাকি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

MU Murdoch University

সত্যজিৎ রায়ের
সোনার কেল্লা
MU Murdoch University

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

অনন্ত বৃত্তের আলোকরেখা

বাতায়ন এবং রঙ্গমঞ্চ মিলে এ এক অনন্য প্রয়াস। কয়েক বছর আগে আত্মীয়তার সূত্রে অনুশ্রী বৌদির মনে জন্মেছিল এক ইচ্ছে, বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়িতে অফুরন্ত ছবি, গল্প আর স্মৃতির ভাণ্ডার দেখে। কিন্তু ইচ্ছা একা কখনও পথ দেখায় না; ঠিক সময়ে সংযোগ না হলে সেতারে ধুন ওঠে না। তাই যখন সুপ্রিয় তার কচিকাঁচাদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে "হীরক রাজার দেশে" মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নিল, তখনই সন্দীপ রায়ের পার্থে আসা চূড়ান্ত হলো।

শরীর খারাপ, আশা-হতাশার দোলাচল, অনিশ্চয়তার ঘনঘটা, সবকিছু কাটিয়ে তিনি স্ত্রী ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন আমাদের শহরে। সিডনি-মেলবোর্নের ঝলমলে আলোয় যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের অনেকেই পার্থে আসেন না; আমরা দেখি তাঁদের ছবি বন্ধুদের সোশ্যাল মিডিয়ায়, আর বুকের ভেতর দীর্ঘশ্বাস জমে। কিন্তু অল্প কিছু মানুষের স্বপ্ন আর সৌরদীপের নিরলস প্রচেষ্টায় সন্দীপ রায় এলেন, এটাই ছিল বিস্ময়ের শুরু।

"হীরক রাজার দেশে" নাটকটি ছিল অবাক করা। শিল্পীরা শুধু বাংলা বলেননি, ছন্দে মিশিয়ে এক অভিনব পূর্ববঙ্গীয় ধারায় ভাষাকে রাঙিয়েছেন। CGI-র দক্ষতায় ডন রাসেল থিয়েটারের মঞ্চে উঠে এসেছিল বিশাল রাজার মূর্তি, আর তার পতনের প্রতীকী দৃশ্য, নতুন প্রজন্মের হাতে সাম্রাজ্য ভাঙার রশি। নাটক শেষে গল্পের ঝাঁপি খুলে গেল, বাঘমামা নয়, বাঘমামি; ওষুধের ঘুম ভেঙে তাঁর সেই ছোট্ট থাবা মারার মুহূর্তে সবাই কেঁপে উঠেছিল।

জানলাম, সত্যজিৎ রায় কী নিপুণ হাতে স্টোরিবোর্ড আঁকতেন, প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি চরিত্রের পোশাক, দাড়ি-গোঁফ, মেকআপ, সবই আগে থেকে ভাবা। দেখলাম যন্তর-মন্তর ঘরের ছবি; শুনলাম কীভাবে হরেক রকম জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই অদ্ভুত যন্ত্র। তখন তো কম্পিউটারের সূক্ষ্ম কারিকুরি ছিল না, ছিল পরিচালকের চোখ, যা কালো কাপড়ের আড়াল থেকেও গল্প বলতে পারত।

গল্পের ভাঁড়ার খুলতেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। শেষে কচিকাঁচারা তাঁর হাত থেকে পেল স্বীকৃতির স্বাক্ষর। আজ নয়, আরও বিশ বছর পরে তারা বুঝবে, সেই মুহূর্তের সম্মান কতখানি।

পরের দিন কিম বিজলি থিয়েটারে ছিল কথোপকথনের আসর। বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়ির ছবি, স্মৃতি আর অফুরান গল্প, "শতরঞ্জ কে খিলাড়ি"-তে সঞ্জীব কুমারকে দাবার চাল শেখানো থেকে "নায়ক"-এর ট্রেনের দৃশ্য। ট্রেনের কামরা এত শক্তপোক্ত ছিল যে দোল খাওয়ানো অসম্ভব, অগত্যা মহানায়কের অভিনয় আর ফ্রেমের আড়ালে সত্যজিৎ রায়ের ফ্লাস্ক নাড়ানোর সূক্ষ্ম কৌশলেই তৈরি হলো এক অমর দৃশ্য।

এমন আরও কত না-জানা গল্পে আবারও সন্ধ্যা নেমে এলো।

আমার উপরি পাওনা, তাঁর আমাদের বাড়িতে আসা।

গণিত বলে, বৃত্তের কোনো শেষ নেই। স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, চিন্তা, সবই এক অনন্ত বৃত্তে ঘুরে চলে। সেই চক্রের ভেতরেই সূর্য ওঠে, নক্ষত্রেরা স্নান সেরে আবার ফিরে আসে। তবু আজ মনে হচ্ছে, আমার প্রবাসজীবনের বৃত্ত যেন এসে মিলেছে এক গভীর পরিতৃপ্তির বিন্দুতে।

আমার বরের ভালোবাসার মানুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; আর আমি – প্রজন্মকে তোয়াক্কা না-করা এক ডাই-হার্ড

উত্তমভক্ত। খুনসুটি চললেও আমাদের ঘরে সত্যজিৎ রায়ই চিরদিনের সূত্রধর – তাঁর ছবি, তাঁর স্মৃতি, তাঁর সৃষ্টির আলোয়ই আমাদের নিশিযাপন। আর আজ সেই ঘরেই এসে বসলেন তাঁর পুত্র সন্দীপ, এক আন্তরিক হাসিতে যেন জীবন্ত করে দিলেন আমাদের সমস্ত ভালোলাগার মানুষদের।

পারিবারিক পরিসর তো আছেই, কিন্তু এ যেন আমাদের পরিবারের বাইরে আর-এক বৃত্তের পূর্ণতা।

এক দীর্ঘদিনের অনুভব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের নীরব সম্পূর্ণতা।

এই আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মানুষগুলো আজ অনেক দূরে। হাত বাড়ালেও ছোঁয়া যায় না। তবু সকালের রোদে, আগামীর ভোরে, গভীর রাতের তারার ঝিকিমিকিতে নিশ্চিত জানি – তারা আছে। থাকবে। যতদিন নিঃশ্বাস আছে, ততদিন এই অনুভবও বেঁচে থাকবে।

মনে হচ্ছিল, গল্পের ভাঁড়ার তাঁর অশেষ। আরও কত কথা যে অশ্রুত রয়ে গেল! হয়তো গল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য এখানেই, সবটুকু বলা হয় না, কিছু না-বলা থেকেই যায়, যাতে আবার ফিরে আসার ইচ্ছে জন্মায়।

তাই অপেক্ষায় থাকব। হয়তো আবার কোনোদিন, গুপী-বাঘার মতো হাত মিলিয়ে তালি দিয়ে তাঁকে ডাকব। আবার বসব গল্পের আসরে, চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যের হাসি-কান্না, সংগ্রাম আর সৃষ্টির আনন্দ শুনতে।

জীবনের সব প্রাপ্তি বড়ো করে ঘোষণা করা যায় না। কিছু অনুভূতি নিঃশব্দেই হৃদয়ে বাসা বাঁধে। এই দিনটিও তেমনই থেকে যাবে – আমাদের সংসারের নয় শুধু, আমাদের ভালোলাগার, স্মৃতির, সংস্কৃতির এবং ভালোবাসার সেই অনন্ত বৃত্তের এক উজ্জ্বল পরিধি হয়ে।

ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আগামীতে তোমার সৃষ্টির অপেক্ষায় রইলাম। আবার কোনোদিন পর্দায় ভেসে উঠুক – "Sandip Ray Presents . . ."। সেই পরিচিত অক্ষরগুলোর মধ্যে আমরা আবার খুঁজে নেব গল্পের জাদু, স্মৃতির আলো আর আমাদের চিরকালের ভালোলাগার মানুষদের।

Suparna is a Senior IT project manager in the public sector. Amid tight schedules, her dream of becoming an author thrives, driven by a passion for storytelling. Her narratives echo the migrant's grief, seasoned with lived experiences and the joy of travel. Balancing work with the enchantment of motherhood, Suparna finds laughter, love, and a craving for precious time with her family.

অমৃতা মুখার্জি

পাগলি ফিরে আয়

দীপাঞ্জনা চলে গেল
শ্রীসদনের সামনের দোলের কমলা
আবীর মাখা সকাল টা আঁচলে বেঁধে!

ওর পায়ের ঘুঙুর তো এখনো বাজছে
গলায় পলাশ কলির মালা
চিকন কোমরে উত্তরীয়

কপালে সন্ধ্যামণি কালো টিপ
হাসিতে লেগে আছে লাল মাটির সোহাগ।
এরকম যাওয়ার মানে টা কি?
সীমান্ত পল্লী, আশ্রম মাঠ, গৌর প্রাঙ্গণ
সাহিত্য সভা সব ছেড়ে তুই কোথায় দৌড়ে চললি?

আমাদের শান্তিনিকেতনের সেই দিন গুলো
চুরি করে এরকম পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিলনা
সবে তো বসন্ত গেল
শালের ফুলে, শিমুলের পাপড়ি তে এখনো বেণুকুঞ্জ ম ম করছে

আর সেই পাগল কবি টা আবার এসেছে,
পকেটে লুকনো খাতা, তোর খোঁজ করছে

ওরে পাগলি ফিরে আয়
আধ লেখা কবিতা টা শেষ করে যা! আর মুখটিপে হাসা বন্ধ কর
দস্যি মেয়ে
নাকছাবি তে প্রাণভোমরা গুনগুন করছে!

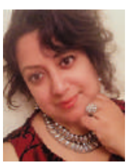

অমৃতা মুখার্জী – সাহিত্যের জগতে পা দিয়েছেন মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই প্রকাশিত ১১টি বই । ইংরাজী ও বাংলায় সমান দক্ষতায় লিখে চলেছেন। প্রথম উপন্যাস হাউস ওয়াইফ চলচিত্রায়ণের পথে, অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। জনপ্রিয় বই গুলির মধ্যে আছে এক আকাশ কবিতা, কাদম্বিনীস আজকাল। ফাইন্যান্স প্রমিস সর্বোচ্চ বিক্রিত আমাজনে। পেশায় চিকিৎসক। থাকেন আমেরিকার ফ্লোরিডায়। নিজের কবিতা নিজে আবৃত্তি করেছেন মিউসিক ভিডিওতে। যোগাযোগ : ritadoc2012@yahoo.com

শুভ্র দত্ত

লিমেরিক

কত কি বা ঘটে জগতে, হঠাৎ না জানি কেমন করে
বস্ত্রালয়ের আত্মা ঢুকিল দেহ ফার্মাসি স্টোরে
শপিংবিলাসী ভদ্রমহিলা
ঔষধালয়ে প্রবেশি – কহিলা
অ্যাসিডিটির কি মেডিসিন আছে ? নামিয়ে দেখাও তো রে।

দোকানি বলেন, ট্যাবলেট আছে, আছে ভালো ক্যাপসুলও
তাছাড়া দেখুন, ওই তাকে আছে মিক্সচার কতগুলো
নানান কালার নানান ফ্লেভার
কি কি চাই, দিদি, বলুন এবার
প্রত্যেকটাই দারুন, বাড়িয়ে বলছি না এক চুলও।

বলেন ম্যাডাম, আগে ভালো কিছু ক্যাপসুল দেখি দাদা
আহা, লাল-নীল নয়, আমি চাই গোলাপী কিম্বা সাদা
ক্যাপসুল দেখি সব একই রকম
শেপ ও সাইজে নয় বেশি-কম
বেছে নেওয়া বেশি সোজা হতো যদি আকারে হতো আলাদা।

বলেন দোকানি, তাহলে বরং ট্যাবলেট নিন বেছে
চৌকো, ত্রিকোণ, গোল ও চ্যাপ্টা, বহুরকমই রয়েছে
কোনোটা হালকা কোনোটা জোরালো
বড়-মেজো-ছোটো, সবই খেতে ভালো
এ দেখুন দিদি, এটা আজকাল ভীষণ হট হয়েছে।

দিদি দোলাচলে মিক্সচার-ট্যাব-ক্যাপসুলরাশি মাঝে
বহু বিকল্পে অস্থির মন স্থির করা যায় না যে
হেনকালে এক যুবতীর উঁকি
অ্যান্টাসিডের সন্ধানমুখী
বলে, এক পাতা জেল-ট্যাব দিন, এখুনি বেরোবো কাজে।

চমকি উঠিয়া ম্যাডাম বলেন, আমি ঐটাই চাই
জেল-ট্যাব বেস্ট, অন্য কিছুই আর প্রয়োজন নাই
কিন্তু কি বলি, ভাগ্যটা যা-তা
সে ওষুধ ছিল শুধু এক পাতা
যুবতী চলিয়া গেল, অধিকার করিয়া সে পাতাটাই।

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যের অপচয়

প্রতিদিন শুধু একই জীবনের ক্ষয়।
সময়ের সাথে স্বার্থের বিনিময়।
তোমার হতাশা একরাশ ভালোবাসা।
মনের শরীর, শরীরের মনোজয়।।

রোজ আমি মরি, বাঁচার আশায় ভোর।
ভাবের ঘরে মোক্ষম হানা চোর।
নিঃশ্বাসে বিষ, বিষেই রক্তক্ষয়।
এ পৃথিবী জুড়ে নিদারুণ অভিনয়।।

কিসের টানে বার বার ফিরে আসা ?
নেশাতুর চোখে না পাওয়ার বিস্ময়।
মনের কিনারে বসে থাকি শুধু একা।
তামসিক প্রেমে সত্যের অপচয়।।

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় – নিজের ব্যাপারে লেখার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে আর বুড়োবেলা কাটছে বিদেশের মাটিতে। কথায় কথায় বেলা বয়ে সামাজিক জটলায় নিজেকে বেশ আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলেছি। এখন অবসরের অছিলায় 'আমি' নামক বস্তুটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তপনজ্যোতি মিত্র

বাইশে শ্রাবণ

তার ‘যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে’, দিগন্ত ছলোছলো
তখন দারুণ কান্না প্রহর, বাইশে শ্রাবণ হোলো

যখন ‘অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা’, আকাশ কারা ছুঁলো
তখন গভীর জ্যোৎস্না প্রহর, বাইশে শ্রাবণ হোলো

যখন ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে’, ঝড় যে ভীষণ এলো
তখন যে তার আঁধিঘরের প্রবল প্রহর, বাইশে শ্রাবণ হোলো

যখন ‘শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে’ শ্রাবণকন্যা এলো
তখন করুণ দুঃখ প্রহর, বাইশে শ্রাবণ হোলো

যখন ‘মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে’, মরণজয়ী এলো
তখন বিশাল জীবন প্রহর, বাইশে শ্রাবণ হোলো

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা ‘বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি’, ‘অমৃতের সন্তানসন্ততি’, ‘ঈশ্বরকে স্পর্শ’, ‘মায়াবী পৃথিবীর কবিতা’, ‘সুধাসাগর তীরে’, ‘সে মহাপৃথিবী’, ‘আকাশকুসুমের পৃথিবী’ । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

বালার্ক ব্যানার্জী

ঘোড়ার জাত

জন্মেছ এমন এক কালে
টিভি মনে করিয়ে দেয় রোজ সকালে
দোষ করা না কি আমাদের রক্তে আছে
ঘাড়ের ওপর generational পাপ।
কিন্তু আমরা তো ঘোড়ার জাত
তাই সহ্য করাই কাজ।
কাকভোরে অ্যালার্ম বাজে
তোমার মুক্তি, তোমার কাজে।
তাই তুলে দিচ্ছি চাবুক মালিকের হাতে
বিনিময় চাই শুধু খাদ্য আর সাজ।
আমরা তো ঘোড়ার জাত
তাই দৌড়ে যাওয়াই কাজ।
পিঠের ওপর অতীতকে নিয়ে
আগামী প্রজন্মকে দেই এগিয়ে।
আমরা দাঁড়ালে থেমে যাবে
না কি এই দুনিয়া আজ।
আমরা তো ঘোড়ার জাত
তাই বহন করাই কাজ।
চোখের আগুন ক্রমশ নিবে আসে,
মাড়ির ফাঁকে রক্তফেনা ভাসে
এখনো এক ল্যাপ বাকি আছে
হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার আগে
করলেও করতে পারো বাজিমাত।
আমরা তো ঘোড়ার জাত
তাই বাজি হারাই কাজ।
জেনো একদিন ঠিক পালাবো,
চাঁদের ওপর খুর চালাবো।
দিগন্তে চোখ তুলে দেখো
ছুটে যায় পাগলা ঘোড়ার পাল।
আমরা তো ঘোড়ার জাত
তাই লাগাম ছেঁড়াই কাজ।

Balarka Banerjee is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company in Sydney. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

আর্যা ভট্টাচার্য

রাগ বসন্ত

ভালোবাসা পেলে আমিও শক্তি হতে পারি।
সোজা উঠে যেতে পারি কাঞ্চনজঙ্ঘায়
অক্সিজেন মাস্ক আর সিলিন্ডার ফেলে রেখে প্রথম শিবিরে।
আতলান্তিকের মাঝে ডুব ডুব ভরে নিতে পারি
দুই ফুসফুস নিশ্চিন্তে অক্লেশে। নোনা জল মধু হবে। অমৃতে বাঁচাবে বিশ্বাস।
আনন্দে চলতে পারি রামধনু নরম গোলাপী ভূঁয়ে, অ্যান্টার্কটিকায়। খালি পায়ে।
পেঙ্গুইনের ডিম চুপিচুপি, বরফ ভেলায় ভেসে নিয়ে এসে, উপহার দিতে পারি যদি তুমি চাও।
বসন্ত এসেছে দ্যাখো !
ভালোবাসা এসে গেলে শুধু তুমি, আর শুধু তুমি,
আমি তো নেই আর কোথাও।।

ভাঙন

ছাড়তে যদি হয় তবে পুরোটাই ছেড়ে দাও।
পাটাতন সরে যাওয়া নৌকোর মতন ছেড়ে দিয়ে ডুবে যেতে দিতে হবে মাঝ দরিয়ায়-অসহায়।
কিছু স্মৃতি হয়তো ডাকবে পিছু তা সে কিছু নয়।
অনেক বছর দিন পার হলে, কদাচিৎ ডুবে যাওয়া কাছির টুকরো টাকরা,
ভাঙা জাহাজের কোনো অযথা সম্পদ ডুবুড়ির হাতে এসে যায়।
সে সব যেখানে থাকে, গ্রথিত প্রথিত, সেখানেই ফেলে যাওয়া বিধি;
সূর্য আর ফুটবেনা জল ভেঙে তাদের চোখের আয়নায়
কোনো প্রার্থনায়।।

মলি সিদ্দিকা

যুবতী কাকলি

গম সোনালি রঙে
বিয়ারের চুমুকে
ক্লান্তি মুছে চনমনে
কখনো বা ক্যাসিনোর আড্ডায়
ভাজা পোড়া, কখনো বা একটু মদ্যপান
ঝকঝকে ঝাড়বাতি আর শত মানুষ
অজানা তাঁদের জীবন
চাওয়া পাওয়া জুয়ার টেবিলে
কেউ বা উত্তাল সুরের সঙ্গে
দেহ দুলিয়ে
কয়েক চুমুকে সব ভুলে
স্বাগতম জানায় ছুটির দিনটিকে
কোনো কবি, আঁকিয়ে শিল্পী
চলে যায় দূর নির্জনে
খুঁজে পেতে নিজেকে
তুলির আঁচড়ে একে একে
এঁকে যায় দুর্লভ গতিকে
কবিতার চয়নে বাঁধা পরে যায়
রোমাঞ্চকর রথ
নির্লিপ্ততার অরিন্দম
ক্ষণিক পিছু ধেয়ে
মুখ ফিরিয়ে নেয়
যুবতী কাকলি
গম সোনালি রঙে
অদ্ভুত এক ঢঙে
বুদবুদে জড়ানো শাড়ীতে
মুহূর্তে অলক্ষ্যে!!

মলি সিদ্দিকা – শিল্প, সাহিত্য এবং মানবতাপ্রেমী লেখিকা মলি সিদ্দিকার একক কবিতার বই “বুনো আঁধার” প্রকাশিত হয় নন্দিতা প্রকাশ থেকে। সাম্প্রতিককালে কবিতায় বেশি স্বাচ্ছন্দ এবং বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে ম্যাগাজিন এবং সংকলনে। তাঁর কবিতা অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে স্প্যানিশ ভাষায় কার্ডিনাল রেভিস্টা লিটেরিয়ায় এবং ভারতের উড়িয়া ভাষায় মাহুড়ি ম্যাগাজিনে। মানবাধিকার বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন কবি অস্ট্রেলিয়া থেকে এবং বর্তমানে সরকারি চাকুরী করছেন। বিষয়ের ভিন্নতাসহ সমাজ এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কবি তাঁর লেখায় পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে।

নরসিংহ কাশ্যপ

ওপাশ – এপাশঃ

প্রায় তিরিশ বছরের ধুলো মুছে
হঠাৎ দেখলাম তাকে –
স্বদেশের এক ভিন্ন স্টেশনে,
অচেনা ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে যেন
চেনা এক দীর্ঘশ্বাস।
গভীর সম্পর্কের মুখটিকে
চিনতে কেমন অসুবিধে হচ্ছিল –
শেষ দেখার সাথে বড় অমিল আজ।
সেই ময়ূরকণ্ঠী রঙ মুছে গেছে,
চোখদুটি ধূসর –
যেন সন্ধ্যার আকাশে জমে থাকা
আলোর নিঃশব্দ ছায়া।
বার্ধক্য শরীরকে হালকা করে দেয়,
কিন্তু স্মৃতিকে ভারী –
একটার পর একটা এসে
ভিড় জমায় বুকের ভেতর,
অতীতের সবুজ প্ল্যাটফর্মে।

আমার এ দমরানো চেহারা
তার চোখে পড়েনি বোধহয়;
সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর
কোনো দোলা জাগেনি মনে।
শুধু দু'জন দুই প্রান্তে
ওপাশ দিয়ে সে চলে যায়,
আমি এপাশে স্থির।
ফেলে আসা গোপন শব্দগুলো
নিঃশব্দে বাজতে থাকে –
ওপাশ আর এপাশের
অদৃশ্য দূরত্বে।

নরসিংহ কাশ্যপ – নরসিংহ কাশ্যপ জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বাসিন্দা। তাঁর শৈশব কেটেছে বিধীচন্দ্রপুর গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি পেশাগত শিক্ষায় দীক্ষিত হন। পেশার পাশাপাশি আবৃত্তি পাঠ এবং কবিতা লেখার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ রয়েছে। তাঁর মতে, কবিতা হলো এক জাদুকরী মাধ্যম – যেখানে নিঃশব্দেও অনেক শব্দ শোনা যায় এবং একান্ত যাপনে কবিতা বলে যায় বহু গোপন কথা। যে কথা কখনো মুখে বলা হয়ে ওঠেনি, যে শব্দ গোত্রহীন কিংবা যে বৃষ্টিতে কখনো ভেজা হয়নি – তার সবটুকুই নিঃসঙ্কোচে পরম মমতায় ধরে রাখে কবিতা।

সুনন্দা সিনহা বোস

অপেক্ষা

হৃদপিন্ডে যখন এক মূক দামামা বাজে
মুহূর্তে মুহূর্তে, প্রহরে প্রহরে
যখন অন্ধকারে অবিরত বয়ে যায়
রক্তিম ধারা –
বাইরে তখন মসৃণ আলোয়
কলকোলাহলে, আবেগে, উদ্বেগে
চরাচর ছেয়ে থাকে –
চলতে থাকে জীবনের খেলা।

অথচ কখন এক নির্মম ইশারায়
থেমে যায় দামামা আর
ভেঙে পড়ে অট্টালিকা ইমারত যতো
সুদৃশ্য বাগানে
শুকিয়ে যায় বর্ণাঢ্য ফুলেরা সব
মমতায় ফুটেছিলো যারা –
আর অপেক্ষায় ছিল
অমরত্বের নিশ্চিত আশ্বাসে।

সমস্ত মুছে যায় এক লহমায়।
থাকেনা কোনো ফুল, কোনো গাছ
ইমারত কাঁপতে থাকে
মরীচিকা যেমন কাঁপে
শুকনো বালুর ওপর
তারপর শূন্যে হারিয়ে যায়।
তবু সেখানে দাঁড়িয়ে
প্রাণপণে ফিরে যেতে চাই
আদিম মুহূর্তে এক
যেখানে আর কিছু নেই
আছে আদিগন্ত
শুধু সমুদ্র বিশাল
শুধুমাত্র জল
শুধু অপেক্ষা
শুধু এক নতুন সূর্যোদয়।

Sunanda Sinha Bose – living in the USA for the past 42 years. Taught ESL and English at a Community College. After retirement teaching as a volunteer, writing, painting and pursuing Indian classical music keeps her busy. I started the literary organization Unmesh 33 years ago in Chicago.

लक्ष्मी कैंची

कल्पवृक्ष

तुमने आग लगा दी
मेरे बचपन के पेड़ को।
मैं जलते पसीने में जागती हूँ,
सपना अभी भी जल रहा होता है।

***

बरगद बोलता है
धीमी आवाज में।
पत्तों की सरसराहट
और फुसफुसाहट के बीच,
उसकी जटाओं में बसे
पक्षियों की उठान
और गान के बीच।
उसकी छाल पर खिंची
उन लकीरों में
जहाँ कीड़े रेंगते हैं
और पनाह लेते हैं।
उन जड़ों के सहारे
जो धरती के फैलाव में
लय की धड़कनें
भरती रहती हैं।

मैं छाया हो जाती हूँ,
और धरती में टपक पड़ती हूँ,
रिसती हुई पहुँचती हूँ उस जगह
जहाँ धरती, पेड़
और आकाश के बीच की गुनगुनाहट
सच की तरह सुनाई देती है।

यह फैलाव नरम है,
अपनापन लिए हुए यहाँ भाषा
पर भाषा, शब्द
पर शब्द, सहलाते हैं,
माँ की भाषा में बोलते हैं।

मैं छाया की उँगलियों से
गहरे खोदती हूँ, और पहुँचती हूँ
उस जगह तक जहाँ
धागे आपस में गुँथते हैं।
जहाँ नदियाँ मिलती हैं,
भाषा पर भाषा,
शब्द पर शब्द, दोहराते हुए,
लहराते हुए, और मेल कराते हुए।

मैं फुसफुसाहटें सुनती हूँ
जो घने आने वाले दिनों तक जाती हैं,
और तस्वीरें मेरी पलकों पर
फड़फड़ाती रहती हैं।

एक रीत में, स्त्रियाँ
उस बरगद के चारों ओर घूमती हैं
जिसकी परिधि में जैसे पूरा
ब्रह्मांड समाया हो। वे उसके
तने पर सूती धागा लपेटती हैं, लाल,
पीला। वही बरगद जिसकी जड़ें
ब्रह्मा हैं, शाखाएँ शिव,
और छाल विष्णु।

यह बरगद बना है
एक कमरे की तरह। जड़ पर जड़
पेड़ से धरती तक
पट्टियों–सी उतरती है।
तना घुस आया है पुरानी
बाड़, तार और लकड़ी में।
जड़ों ने तोड़ दिए हैं
कंक्रीट के रास्ते।
बरगद की खिड़कियाँ हैं।
बरगद का एक दरवाजा है
जो ब्रह्मांड की ओर खुलता है।

इस दर्शन में, जैसे
आईनों से भरे एक कमरे में,
अनेक बरगद दोहराते जाते हैं
बहुत दूर, बहुत दूर, क्षितिज तक।
और यह शाश्वत बरगद,
धरती में जड़ा हुआ,
मुझे सच की एक राह दिखाता है
दरवाजे के खुले होंठों के पार।

***

आंटी वैनेसा कोरुन्ना का दिल से आभार,
जिन्होंने मुझे गहराई से सुनना सिखाया,
और इतने उदार मन से मेरा मार्गदर्शन किया।

Lakshmi Kanchi is an emerging Indian-Australian poet on a mission – to make poetry accessible. Her writing anatomises the complex linkages between language, culture, and perception. Author of "Lakesong", a debut collection, Lakshmi won the 2023 Ros Spencer Poetry Prize and the 2021 Pocketry Prize, and was the Inaugural Poet-in-Residence at The Wetlands Centre Cockburn (2022-23).

ঊর্মি চক্রবর্তী

এক ভোরের পথ - নীল পাহাড়ের ডাকে

ভোরের আলো তখন ঠিকমতো ফোটেনি। আকাশে হালকা নীলচে আভা, পাখিদের কিচিরমিচির, আর গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির – সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত শান্তির আবহাওয়া। প্রতিদিনের মতোই আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। এই হাঁটাটা আমার কাছে শুধু শরীরচর্চা নয়, বরং নিজের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো।

রাস্তার দু'পাশে লম্বা গাছগুলো যেন নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, আর হালকা ঠাণ্ডা বাতাস মুখে এসে লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই চোখে পড়ল – একটু দূরে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। চার্লস ম্যাকেঞ্জি পার্কে – বাঁকশিয়া ফুলের গাছের পাশে তারা নিজেদের মধ্যে গল্পে মগ্ন, মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। আমি একটু বিশ্রাম নেবো বলে বেঞ্চ ছিল পাশেই সেখানে বসলাম। চারজন অচেনা হলেও তাদের মধ্যে এমন একটা উষ্ণতা ছিল, যা আমাকে কাছে যেতে বাধ্য করলো।

আমি তাদের কাছে যেতেই তারা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সেই হাসিতে কোনো সংকোচ ছিল না, বরং ছিল এক সহজ আন্তরিকতা।

"Hi!" – একসাথে বললো তারা।

পরিচয় হলো – Fiona, যার চোখে ছিল অদ্ভুত উজ্জ্বলতা; Ulyana, খুব শান্ত স্বভাবের কিন্তু হাসি খুব মায়াবী; Felicity, প্রাণবন্ত আর একটু দুষ্টু; আর Frank, মজার মানুষ, সবসময়ই কিছু না কিছু বলে সবাইকে হাসানোর চেষ্টা করে।

কথা বলতে বলতে যেন সময় কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা অনেকদিন ধরেই একে অপরকে চিনি। জিজ্ঞেস করাতে বললো, তারা কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছে – প্রকৃতির কাছে একটু সময় কাটাতে।

ঠিক তখনই Fiona হঠাৎ বলে উঠলো,

"আজকের দিনটা নষ্ট না করে, একটা অ্যাডভেঞ্চার করা যাক। ব্লু মাউন্টেন (Blue Mountain) – এ গেলে কেমন হয়?"

এত হঠাৎ করে এমন একটা প্রস্তাব শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। কিন্তু Felicity মৃদু হেসে বললো, "কখনো কখনো সবচেয়ে সুন্দর সিদ্ধান্তগুলো হঠাৎই নেওয়া হয়।"

Ulyana হাততালি দিয়ে উঠলো,

"Yes, Let's go!"

Frank হেসে বললো আমাকে,

"গাড়ি তো আমার আছেই, শুধু তোমার 'yes' বলার দরকার।"

তাদের এই উচ্ছ্বাস, সরলতা আর মুহূর্তটাকে উপভোগ করার মানসিকতা আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি একটু ভেবে বললাম, "alright, let's proceed."

তারপরই শুরু হলো আমাদের যাত্রা।

গাড়ি চলতে শুরু করলো, শহরের ব্যস্ততা পেছনে পড়ে রইলো। সামনে শুধু লম্বা রাস্তা, সবুজ বন আর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলা। জানলার বাইরে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল – প্রতিটা দৃশ্য যেন একেকটা ছবি।

Frank মাঝেমাঝে গান চালাচ্ছিল। Fiona সেই গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল। Ulyana আর Felicity গল্প করছিল, আর আমি সেই মুহূর্তগুলোকে নিজের মধ্যে জমা করে নিচ্ছিলাম আর ক্যামেরাতে বন্দি করে রাখছিলাম।

যখন আমরা ব্লু মাউন্টেনে (Blue Mountain) – পৌঁছালাম, তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে আর নীল আকাশে ছড়িয়ে ছিল টুকরো টুকরো মেঘ – ঠিক যেন কেউ ক্যানভাসে তুলি দিয়ে এঁকেছে। কিন্তু ওখানকার বাতাসে এক অন্যরকম ঠাণ্ডা আর সতেজতা ছিল।

দূরে তাকাতেই দেখা গেল অসীম বিস্তৃত পাহাড়, যেগুলো হালকা নীল কুয়াশায় ঢাকা – ঠিক যেন কোনো স্বপ্নের জগৎ। নিচে সবুজ উপত্যকা, আর মাঝে মাঝে পাখিদের উড়ে যাওয়া – সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমরা একটা ভিউপয়েন্টে গিয়ে দাঁড়ালাম – সেখানে প্রচুর rainbow lorikeet আর sulphur crested cockatoo উড়ে এসে বসলো আর আমরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লাম এই মনোরম দৃশ্য দেখে। সবাই নিজের মতো করে এই সৌন্দর্যটা অনুভব করছিল।

হঠাৎ Felicity মৃদু স্বরে বললো,

"Nature has a way of healing everything, isn't it?"

আমি মাথা নাড়লাম। সত্যিই, সেই মুহূর্তে সব দুশ্চিন্তা, সব ক্লান্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল।

Fiona হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠলো – তার কণ্ঠে ছিল এক অদ্ভুত মাধুর্য। পাহাড়ের মাঝে সেই গান প্রতিধ্বনিত হয়ে পরিবেশটা আরো সুন্দর হয়ে উঠলো।

Frank ক্যামেরা বের করে আমাদের চারজনকে একসাথে দাঁড়াতে বললো। আমরা হেসে, মজা করে অনেক ছবি তুললাম। Frank আবার তার মজার গল্প শুরু করলো, আর আমরা সবাই হেসে উঠলাম। সেই হাসির শব্দ পাহাড়ের নীরবতার সঙ্গে মিশে এক অন্যরকম সুর তৈরি করছিল। ঘন্টা তিনেক কাটানোর পর আমি সবাইকে বললাম যে Wentworth falls এর দিকে যাওয়া যাক আর আমার প্রস্তাব শুনে Fiona, Felicity, Ulyana আর Frank লাফিয়ে উঠলো।

আমরা রওনা হয়ে গেলাম আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যে Wentworth Falls-এ পৌঁছে ওখানকার মনোমুগ্ধকর পরিবেশে, এক নিমেষে সবাই হারিয়ে গেলাম। লুকআউটে পৌঁছে যখন ঝর্ণার সেই অপরূপ দৃশ্য দেখলাম – উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশি সবুজ উপত্যকার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে – তখন কিছুক্ষণের জন্য সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেলাম। তারপর শুরু হলো হাসি, গল্প আর অগণিত ছবি তোলা। ঠান্ডা পাহাড়ি হাওয়া আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছিল, আর ঝর্ণার গর্জন যেন এক অন্যরকম সুর তুলেছিল। পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির আরো কাছাকাছি চলে এলাম আর সেই অনুভূতি লিখে বোঝানো যায়না। Felicity r Frank বিশেষ করে ওখানেই থেকে যেতে চাইছিল।

দুপুরের দিকে আমরা একটু নিরিবিলি জায়গায় বসে খাবার খাবো বলে ঠিক করলাম। সবাই মিলে গল্প করতে করতে একটা বেশ সুন্দর খাবার জায়গা চোখে পড়লো আর নামটা খুব আকর্ষণীয় ছিল – Grayson & Gloria's Restaurant। ওখানে গিয়ে আমরা পাঁচজন মিলে একটা কোনের দিকে গিয়ে বসলাম যাতে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যায়। আমরা নিজেদের গল্প শেয়ার করলাম – কে কোথা থেকে এসেছে, জীবনের ছোট ছোট স্মৃতি, স্বপ্ন – সবকিছু। সবাই যার যার পছন্দের খাবার অর্ডার দিল – steak, burger। grilled fish, greek salad, chips ইত্যাদি আর তার সাথে sparkling wine। Grayson আর Gloria এত আদর যত্ন করে খাবার serve করলো একটা সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ লাগলো।

আমি বুঝতে পারছিলাম, এই কয়েক ঘণ্টার পরিচয় আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরি করেছে। সময় কেমন যেন দ্রুত কেটে গেল। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়তে শুরু করলো। আকাশে তখন পড়ন্ত সূর্য, তার লাল আভা – ব্লু মাউন্টেন যেন আরো মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠলো।

এবারে সবাই মিলে ঠিক করলাম যে কাছাকাছি কোন জায়গায় গিয়ে ওখানে ঘুরে আরো কিছু প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা যাক তাই এগিয়ে পড়লাম Springwood এর দিকে। ঘণ্টা খানেকের কম লাগলো আর পৌঁছে গিয়ে একটা ছোট্ট কফি শপে – Flora's Cafeteria তে পাঁচজন মিলে বসলাম। বাইরে হালকা ঠান্ডা হাওয়া, আকাশে মেঘের ভেলা – ঠিক যেন গল্প করার জন্য একদম পারফেক্ট পরিবেশ।

কাপের ভেতর থেকে ভেসে আসছে গরম কফির সুগন্ধ, আর টেবিলের চারপাশে ছড়িয়ে আছে হাসি, মজা আর পুরনো দিনের স্মৃতি। একজন হঠাৎ স্কুলের সেই মজার ঘটনা তুলে ধরতেই সবাই হেসে লুটোপুটি – "মনে আছে, সেদিন কী হয়েছিল?" আরেকজন বলে ওঠে, "ওসব ভুলে থাকা যায় নাকি!"

কফির চুমুকের সাথে সাথে জমে ওঠে আড্ডা – কখনও ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কখনও জীবনের ছোটখাটো দুঃখ-সুখ। কেউ বলছে নতুন প্ল্যানের কথা, কেউ আবার বলছে পুরনো ভালোবাসার গল্প। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু পাঁচ বন্ধুর কণ্ঠে বয়ে যাচ্ছে গল্পের স্রোত।

বাইরের কোলাহল থেকে একটু দূরে, এই ছোট্ট কফি শপে বন্ধুদের এই মুহূর্তটাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে মূল্যবান – কারণ এখানে আছে নিখাদ বন্ধুত্ব, যেখানে কোনো অভিনয় নেই, আছে শুধু নিজের মতো করে বাঁচার আনন্দ।

শেষে যখন কফির কাপ খালি হয়ে আসে, তখনও গল্প শেষ হয় না – কারণ সত্যিকারের বন্ধুত্বে আড্ডা কখনো শেষ হয় না, শুধু পরের দিনের অপেক্ষা থেকে যায়।

দিনের শেষে এই ভ্রমণ শুধু একটি ঘোরাঘুরি নয়, বরং হয়ে উঠল একগুচ্ছ অমলিন স্মৃতি – বন্ধুত্ব, আনন্দ আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা।

দুপুরের দিকে আমরা একটু নিরিবিলি জায়গায় বসে খাবার খেলাম। নিজেদের গল্প শেয়ার করলাম – কে কোথা থেকে এসেছে, জীবনের ছোট ছোট স্মৃতি, স্বপ্ন – সবকিছু। আমি বুঝতে পারছিলাম, এই কয়েক ঘণ্টার পরিচয়

আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরি করেছে। সময় কেমন যেন দ্রুত কেটে গেল। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়তে শুরু করলো। আকাশে তখন পড়ন্ত সূর্য, তার লাল আভা – ব্লু মাউন্টেন যেন আরো মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠলো।

ফিরে আসার সময়টা একটু কষ্টের ছিল। গাড়িতে ওঠার আগে আমরা সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

Fiona বললো, "Some days are not just days...they become memories forever." Felicity উত্তরে বললো "I fully agree with you. It was a moment to cherish and lucky to meet with you all."

আমি মৃদু হেসে বললাম,

"Meeting all of you was an absolute pleasure. The shared smiles, heartfelt conversations, and beautiful moments made the day truly special. It is one of those experiences that leaves a lasting impression on the heart and becomes a treasured memory to look back on with happiness and gratitude."

সেই দিনটার পর হয়তো আমরা আবার নিজের নিজের জীবনে ফিরে গেছি। কিন্তু সেই ভোরের হাঁটা, চারজন অচেনা মানুষের সঙ্গে পরিচয়, আর ব্লু মাউন্টেনে-এর সেই অদ্ভুত সুন্দর ভ্রমণ – সবকিছু মিলে একটা গল্প হয়ে রয়ে গেছে আমার মনে।

একটা সাধারণ সকাল, যা আমার জীবনে এনে দিয়েছিল অসাধারণ কিছু মুহূর্ত ... আর শিখিয়ে দিয়েছিল –

জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ঘটনাগুলো অনেক সময় পরিকল্পনা বিহীন ভাবে ঘটে।

Urmi Chakraborty presently lives in Sydney. She has a great passion for travelling and love to explore new places, avid reader of english novels. She wrote numerous hindi poems and english articles in facebook and different blogs. She is extremely happy to share her creation with Batayan's readers.

অঞ্জন রায়

শতবর্ষে রুট ৬৬

১৯৫০-এর দশক। ইলিনয়ের শিকাগো থেকে নিজেদের গাড়িতে করে স্ত্রী থেমা, তিন সন্তান এবং বাড়ির কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে রুট ৬৬ ধরে সপরিবারে লঙ ড্রাইভে বেরিয়েছিলেন কার্ল মোসার, খোশমেজাজ, উদ্দেশ্য নিউ মেক্সিকো স্টেট-এ যাওয়া। পেরিয়ে গেলেন ইলিনয়ের সীমানা, এর পর মিসৌরি এবং কেনসাস স্টেটদুটি পেরিয়ে ওকলাহোমার ক্লেয়ারমোর এবং টালসার মাঝে রাস্তার ধার থেকে "আটকে পড়া" একটি যুবককে তাঁরা গাড়িতে তুলে নিলেন। ভেবেছিলেন যে হিচ-হাইক করা যুবকটিকে তার গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দেবেন। যুবকটির নাম বিলি, পুরোনাম উইলিয়াম এডওয়ার্ড কুক (জুনিয়ার)। বেশ চলছিল, গল্পগুজবে সময় কাটছিল বেশ। কিন্তু মোসাররা বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেননি যে অচেনা এই যুবকটি আসলে কে? সে যে একজন খুনী এবং দাগী আসামী তা তাঁরা আঁচও করতে পারেননি। অচিরেই বিলি তার স্বমূর্তি ধারণ ক'রে মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে পুরো মোসার পরিবারকে পণবন্দী করে এবং কার্লকে মাইলের পর মাইল অবিরাম গাড়ি চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। আতঙ্কিতা স্ত্রী থেমা কিম্বা বাচ্চাদের কিছুই করবার ছিলনা। কার্ল যা পারতেন তা হল নিজের এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে বিল-এর হুকুম বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলা। ওরা পেরিয়ে গেলেন ওকলাহোমা, টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, অরকস স্টেট-এর সীমানাগুলি। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ফিরে আসেন মিসৌরিতে। বিলির বাড়ির কাছের শহর জপলিন-এর কাছে পৌঁছে বিলি একে একে মোসার পরিবারের সবাইকে, এমনকি পরিবারের কুকুরটিকে পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করে, তারপর তাদের মৃতদেহগুলি একটি পরিত্যক্ত খনির ভেতর লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। বলাবহুল্য যে বিল শেষপর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়েছিল মেক্সিকো থেকে।

মেক্সিকোতে ধৃত বিখ্যাত দস্যু বিলি।

আমি এখানে আমেরিকার ডাকাতদের গল্প লিখতে বসিনি। তবে যারা এ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন, লঙ ড্রাইভে যেতে ভালোবাসেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালোবাসেন কিম্বা ইতিহাস ভালোবাসেন তাদের অনেকে বেড়াবার পথের আশপাশের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতে চান। রাস্তার বিপদ এবং দীর্ঘ পথযাত্রার ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া ছিল অতি প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে মধ্য আমেরিকায় মাইলের পর মাইল ছিল জনমানবহীন নির্জলা পতিত জমি। শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে ডাক্তারখানা কিম্বা কোন হাসপাতাল ছিলনা। ছিলনা দস্যু-ডাকাতদের হাত থেকে রেহাই পেতে পুলিশ চৌকি। ছিলনা মোবাইল ফোন। শুনলে হয়তো অবাক হবেননা যে মিসৌরির বিখ্যাত দস্যু জেসি জেম্স এর জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে জনপ্রিয়

একটি মোমের মিউজিয়াম। লোকে এই মিউজিয়ামটি দেখতে যান কেননা কিছু লোকের কাছে জেসি জেম্স ছিল "রবীন হুড" এবং তার লুকিয়ে থাকার জায়গা ছিল মিসৌরি স্টেট-এর স্ট্যান্টন-এর মেরাম্যাক গুহায়। মাটির তলাকার লাইট দিয়ে সাজানো এই মেরাম্যাক গুহাগুলি স্ট্যালেগটাইট ও সট্যালাগমাইটের জন্য বিখ্যাত।

রুট ৬৬ - ইলিনয়ের কান্ট্রিসাইড শহরের একটি এলাকায়।

১৯২৬ থেকে ২০২৬, শতবর্ষে পরা রুট ৬৬ আমেরিকার সবচেয়ে পুরানো হাইওয়ে। বলাবাহুল্য যে রুট ৬৬-এর স্রষ্টা সাইরাস এ্যাভেরি এবং এটি রাতারাতি তৈরি হয়নি। এটি বিচ্ছিন্ন কতগুলি রাস্তা এবং চলার পথকে একত্রিত করে সৃষ্ট হয়েছিল। ২৪৪৮ মাইল বিস্তৃত এই হাইওয়েটি ইলিনয়ের শিকাগোর ক্যালুমেট বীচ থেকে শুরু হয়ে মিসৌরি, কেনসাস, ওকলহোমা, টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা স্টেটগুলি পেরিয়ে শেষ হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মোনিকায়। স্প্যানিশ "সান্টা" শব্দটির ইংরাজি অর্থ হল Saint। এই হাইওয়েটি এখনও আছে এবং তা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত, তবে সরাসরি নয়। কোথাও বা ইন্টারস্টেট হাইওয়ের সঙ্গে, কোথাও বা স্থানীয় রুরাল হাইওয়ের সঙ্গে আবার কোথাওবা স্থানীয় রাস্তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই হাইওয়েটিকে বলা হত "Mother Road"। রুট ৬৬ হাইওয়েটির ইতিহাসে হত্যা এবং রাহাজানির কাহিনী যেমন আছে তেমনি আছে অনেক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান, যেগুলি ভ্রমণ পিপাসুদের যুগ যুগ ধরে আকৃষ্ট করে এসেছিল। প্রত্যেকটি স্টেট-এই অজস্র দর্শনীয় স্থান ছিল এবং আজও আছে। আমেরিকায় ইন্টারস্টেট হাইওয়ে শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সাল থেকে। এখনও অনেক মানুষ আছেন যারা দূরপাল্লার মোটর ড্রাইভ ভালোবাসেন। রুট ৬৬-এর পথে ছিল ড্রাইভ-ইন থিয়েটার, মোটেল, রেস্তোঁরা, নেটিভ আমেরিকানদের টোটেম পোল, পুরানো দিনের পেট্রোল পাম্প, অভিনব সব বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। তবে শুধু ডাকাত বদমাইশ অথবা ভ্রমণ পিপাসুরাই নন, অনেক সাধারণ গরীব মানুষও রুট ৬৬ ধরে পশ্চিমে গিয়েছেন ভাগ্যের সন্ধানে। এখানে কয়েকটি তথ্য আমি পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই আর তা হল যে আমেরিকায় প্রথম স্টীম-বাহিত ট্রেন চালু হয়েছিল ১৮২৯

রুট ৬৬-এর পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে একটা রেস্তোঁরার সামনে উঁচু করে রাখা কেচআপ-এর বোতল।

সালে যার নাম ছিল স্টাওয়ারব্রিজ লায়ন, যাকে ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিল, এটি চলেছিল পেন্সিলভানিয়ার হসডেল-এ। আর আমেরিকায় ঘোড়া-বাহিত যাত্রী ট্রেন প্রথম চলেছিল বাল্টিমোর থেকে ওহায়ো, ১৯৩০ সালে। এদেশে দূরপাল্লার ট্রেন প্রথম চলেছিল ১৮৬৯-এ সালে, নেব্রাস্কার ওমাহা শহর থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিস্কো শহর পর্যন্ত। যদিও আমেরিকায় প্যাসেঞ্জার প্লেন প্রথম চলেছিল ১৯১৪ সালে, তবে জেট যুগ শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সাল থেকে। প্রসঙ্গত, ভারতে যাত্রীবাহী ট্রেন প্রথম চলেছিল ১৮৫৩ সালে, বম্বে থেকে থানে। তবে মালগাড়ি প্রথম চলেছিল মাদ্রাজে ১৯৩৭ সালে। আমি বেশ কিছু আমেরিকান পরিবারকে জানি যাঁরা ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ট্রেনে করে সপরিবারে শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। তারও আগে আমরা দেখেছি মানুষ যেতেন ঘোড়া চালিত "ওয়াগনে" করে দূর থেকে দূরান্তে। রাস্তায় মাঝে মাঝে ছিল ট্র্যাভার্ন, যাত্রীদের নিরাপদে রাত কাটাবার জন্য। তৈরি হয় মোটেল এবং হোটেল। আমরা যারা যৌবনে কলকাতার সাহেব পাড়ায় হলিউডে তৈরি জন ওয়েন-অভিনীত ওয়েস্টার্ন মুভিগুলি দেখেছি তাদের হয়তো কিছুটা ধারণা হবে।

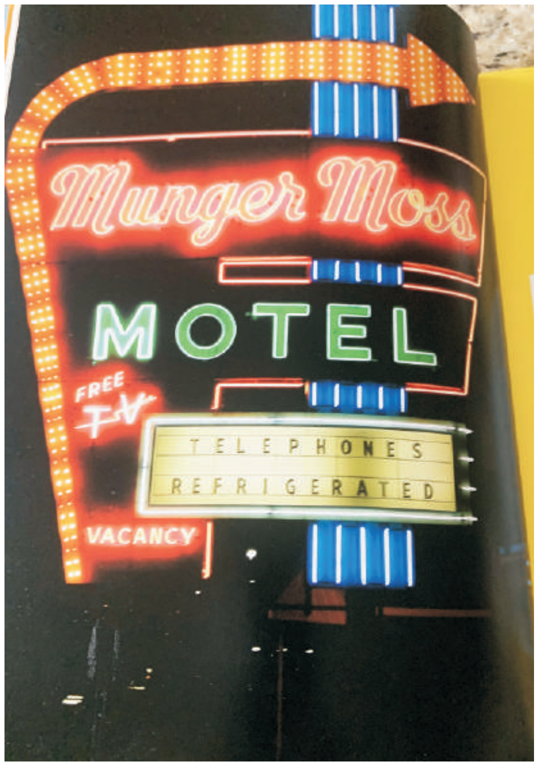

রুট ৬৬-এর ওপর ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করতে আলোকজ্জল একটি মোটেল।

রুট ৬৬-এর অন্যতম ইতিহাসবিদ এবং গবেষক জিম হিঙ্কলি লিখেছেন যে রুট ৬৬ শুধু মাত্র একটি রোড ট্রিপ ছিলনা এটি ছিল একটি আবেগ। এই রুটে যাওয়া ছিল একগুচ্ছ স্বপ্নের মেলবন্ধন। এখানে অতীত, বর্তমান এমন কি ভবিষ্যতের নিরন্তর আসা যাওয়া। কাজেই এই পথে বেরিয়ে আবেগতাড়িত আমেরিকানরা এতটাই অদূরদর্শী হয়ে পড়তেন যে নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে তারা রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা জায়গাগুলি দেখবার জন্য হাইওয়ে ছেড়ে নেমে যেতে ইতস্থতঃ করতেন না। যেমন আগুপিছু না ভেবে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা অজানা যুবক বিলিকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন মোসাররা। এই পথে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থানগুলি যেমন ছিল তেমনি ছিল পরিত্যক্ত শহর এবং দস্যুদের আস্তানাগুলিও। Jim Hinkleyi একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আজ শেষ করবো –

"In Arizona, a detour of just a dozen miles (19.3 kilometers) is all that is needed to escape the desert heat for the pine forested oasis of Hualapai Mountain Peak and enjoy fine dining at the historic Hualapai Mountain Lodge as Elks graze outside the window."

বলাবাহুল্য যে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট-এ রুট ৬৬-এর শতবার্ষিকী পালন করার খবর আছে। একদল উৎসাহী লোক সাইকেলে করে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মোনিকা থেকে শিকাগো পর্যন্ত রুট ৬৬ ধরে পরিক্রমণ করেছেন। এঁদের একজন এন পি আর রেডিওতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন রুট টি এখনও আছে তবে অনেক জায়গায় অযত্নে অবহেলায় রাস্তাগুলি ভঙ্গুর এবং দুর্গম।

Anjan Roy — Anjan is a Freelancing Journalist writing in different Bengali Journals and Magazines in the US and abroad. He lives in Willowbrook, Illinois. Recipient of Mother Teresa Fellowship. He did master's degree of social work from Washington University Saint Louis, Missouri, USA. He was an eminent Journalist in Kolkata worked with Ananada Bazar Patrika, All India Radio and Calcutta Television and many others. Wrote articles and news-stories for Ananda Bazar Patrika, Desh, Hindusthan Standard,

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

ইয়েটস – কবি হয়ে ওঠার কাহিনী

চারবার প্রস্তাব, চারবার প্রত্যাখ্যান

ত্রিশ বছরের মধ্যে চারবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি – প্রতিবারই উত্তর ছিল 'না'। অথচ সেই নারীই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা, তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্মদাত্রী, এমনকি তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির নেপথ্য ছায়া। ১৮৮৯ সাল, ডাবলিন। মাত্র তেইশ বছরের তরুণ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এক সাহিত্যিক সমাবেশে প্রথম দেখলেন এক নারীকে – যিনি হয়ে উঠবেন তাঁর আজীবনের মোহ ও যন্ত্রণার উৎস। সেই নারী মড গন – বয়স বাইশ, সৌন্দর্যে দীপ্ত, ব্যক্তিত্বে দুর্ধর্ষ। আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, তীব্র বুদ্ধিমত্তা ও চৌম্বক আকর্ষণে পরিপূর্ণ। ইয়েটস মুহূর্তেই মুগ্ধ হলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝলেন, তিনি হারিয়ে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই কবিতা লিখতে শুরু করলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মড গন বিনীতভাবে বললেন, "না"। এরপর আরও তিনবার বলবেন সেই একই কথা। কিন্তু তিনি ইয়েটসকে উপহার দেবেন এমন কবিতা, যা ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

কবির জন্মভূমি ও মানসজগৎ

ইয়েটস ছিলেন এক শিল্পনিবাসী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন চিত্রশিল্পী। শৈশব কেটেছে ডাবলিন ও পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের স্লাইগো কাউন্টিতে। স্লাইগোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, রুক্ষ প্রকৃতি আর লোককথার আবহ তাঁর কল্পনাশক্তিকে গড়ে তুলেছিল। এই ভূমির মিথ, কিংবদন্তি, এবং প্রকৃতিই পরে তাঁর কবিতার আত্মা হয়ে ওঠে। যখন ইয়েটস মড গনের সঙ্গে দেখা করেন, তখন তিনি ইতিমধ্যে কবিতায় ও আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যিক পুনর্জাগরণে গভীরভাবে যুক্ত। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আয়ারল্যান্ডের নিজস্ব সাহিত্য ও পরিচয়কে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু মড গন তাঁর কবিতায় এক নতুন তীব্রতা, নতুন বেদনা, নতুন আলোকসঞ্চার এনে দিলেন।

না পাওয়া প্রেমের গল্প

মড গন ছিলেন ইয়েটসের স্বপ্নের প্রতিমা – সুন্দরী, স্বাধীনচেতা, আয়ারল্যান্ডপ্রেমী, বিপ্লবী। তিনি যেন সেই আয়ারল্যান্ডেরই প্রতিরূপ, যাকে ইয়েটস তাঁর কবিতায় উদযাপন করতে চেয়েছিলেন – অদম্য, গৌরবময়, অথচ অধরা। মড ইয়েটসকে সম্মান করতেন – তাঁর কবিতা, তাঁর চিন্তাশক্তি, তাঁর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে। তাঁরা একসঙ্গে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কাজ করতেন। নিয়মিত চিঠি লিখতেন পরস্পরকে। কিন্তু ভালোবাসতেন না। অন্তত সেইভাবে নয়, যেভাবে ইয়েটস তাঁকে ভালোবাসতেন। চৌদ্দ বছর ধরে ইয়েটস বারবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আর মড প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কখনো বলেছিলেন – বিবাহ তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক কাজ থেকে বিচ্যুত করবে। কখনো বলেছেন – তাদের বন্ধুত্বই তাঁর কাছে শ্রেয়। হয়তো সবকিছুই সত্য ছিল। তবুও মূল সত্য ছিল সহজ – তিনি ইয়েটসকে ভালোবাসতেন না।

হৃদয়ের পরাজয় কিন্তু কবিতার জয়

১৯০৩ সালে মড গন হঠাৎ বিয়ে করলেন জন ম্যাকব্রাইড-কে – একজন আইরিশ বিপ্লবী, যিনি বোয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইয়েটস বিধ্বস্ত হলেন। যে নারী বলেছিলেন তিনি বিবাহে বিশ্বাসী নন, সেই নারী অন্য বিপ্লবীকেই বিয়ে করলেন। বার্তা ছিল স্পষ্ট – মড গন বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু ইয়েটসকে নয়। অসংখ্য মানুষ এমন অবস্থায় পিছু হটত। কিন্তু ইয়েটস তাঁর বেদনা থেকে সৃষ্টি করলেন শিল্প। মডকে নিয়ে তিনি লিখলেন তাঁর অমর কবিতাগুলি – "When You Are Old" (১৮৯৩) "But one man loved the pilgrim soul in you, And loved the

sorrows of your changing face.” “No Second Troy” (১৯১০) “Was there another Troy for her to burn?” এই কবিতাগুলিতে প্রেম, সৌন্দর্য, রাজনীতি, ইতিহাস – সবকিছু মিলেমিশে আছে। তাঁর অপ্রাপ্তি হয়ে উঠল চিরন্তন শিল্প।

খ্যাতি, সংগ্রাম ও নোবেল পুরস্কার

ইয়েটস কেবল প্রেমবিরহে থেমে থাকেননি। তিনি আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যিক পুনর্জাগরণের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। ১৯০৪ সালে তিনি Abbey Theatre প্রতিষ্ঠা করেন – যা পরবর্তীতে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নাট্যগৃহে পরিণত হয়। তিনি নাটক, প্রবন্ধ, তত্ত্ব, রহস্যচিন্তা – সবকিছুতেই লিখলেন। এবং ১৯২৩ সালে পেলেন নোবেল পুরস্কার, প্রথম আইরিশ ব্যক্তি হিসেবে। পুরস্কারপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে লেখা হয়: “His inspired poetry, which in a highly artistic form gives expression to the spirit of a whole nation.” সেই আয়ারল্যান্ডের আত্মা – যে আত্মাকে তিনি মড গনের মধ্যেই প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন।

দাম্পত্য বনাম বন্ধুত্ব

নোবেল জয়ও মুছে দিতে পারেনি তাঁর অনুভূতি। মডের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় ছিল, যদিও জটিল ও বেদনামিশ্র। মডের বিয়ে ভেঙে যায়, তাঁর স্বামী ম্যাকব্রাইড ১৯১৬ সালের বিদ্রোহে অংশ নিয়ে মৃত্যুদণ্ড পান। তবুও তিনি ইয়েটসকে বিয়ে করতে রাজি হননি। ইয়েটস আবার প্রস্তাব দিলেন। আবারও “না”। অবশেষে, ১৯১৭ সালে, ৫২ বছর বয়সে ইয়েটস বিয়ে করলেন জর্জি হাইড-লিজকে – তাঁর চেয়ে ২৭ বছর কনিষ্ঠ, বুদ্ধিমতী ও আধ্যাত্মিক আগ্রহসম্পন্ন এক নারী। বিবাহটি ছিল শান্ত, ফলপ্রসূ ও গভীর। জর্জি “অটোমেটিক রাইটিং”-এর মাধ্যমে ইয়েটসকে নতুন ভাবনার জগতে নিয়ে যান। তাঁর সহচর্যেই জন্ম নেয় ইয়েটসের রহস্যবাদী গ্রন্থ A Vision। এই বিয়েই ইয়েটসকে দিল স্থিরতা, সহচরিতা, ও প্রকৃত সুখ – যা মড কখনও দিতে পারেননি।

মৃত্যু , উত্তরাধিকার ও অমরত্ব

১৯৩৯ সালে, ফ্রান্সে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। ১৯৪৮ সালে তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয় স্লাইগো কাউন্টিতে, তাঁর শৈশবের সেই প্রিয় ভূমিতে। তাঁর সমাধিফলকে খোদাই করা তাঁরই লেখা পঙ্‌ক্তি – “Cast a cold eye On life, on death. Horseman, pass by!” মড গন বেঁচে ছিলেন আরও চৌদ্দ বছর, ১৯৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কখনও বলেননি, ইয়েটসকে প্রত্যাখ্যানের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন কিনা। সম্ভবত তিনি ঠিকই বলেছিলেন – তাদের বন্ধুত্বই হয়তো ছিল তাঁদের নিয়তি। কিন্তু সত্য এই – ইয়েটসের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি জন্মেছিল সেই অসম্ভব প্রেম থেকে। যে প্রেম পাওয়া যায়নি, সে-ই তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব। আর যাকে পেয়েছিলেন – জর্জি – তিনি দিয়েছেন শান্তি। অপ্রাপ্ত প্রেম তাঁকে বানিয়েছে কবি, প্রাপ্ত ভালোবাসা বানিয়েছে মানুষ।

“যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, ঘুমে ভারী চোখে ...” এই পঙ্‌ক্তিগুলি আজও অমর – যাদের জন্য লেখা হয়েছিল, যিনি লিখেছিলেন, এবং আমরা যারা এখনো পড়ি, সকলের ঊর্ধ্বে। এটাই অমরত্ব। এটাই ইয়েটসের কাহিনী – দাম্পত্যের মৃত্যু। যদিও প্রেমের মৃত্যু হয়নি। চিরজাগ্রত। চিরসবুজ ভালোবাসা। ফলগু নদীর মতো তিরতির করে বয়ে চলেছে সেই প্রেম পাঠকের মনে ।

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত – আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়াশোনা। বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক হিসাবে চাকরি করলেও বর্তমানে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার এবং পুরোদস্তুর লেখক। ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প “আলতাফ” আনন্দমেলায়। দুটি কিশোর উপন্যাস “চন্দ্রতালের পরিরা” এবং আনন্দমেলা পুজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত ”ঝুকুমুক”। বড়দের জন্য প্রথম প্রকাশিত গল্প “কুহেলি” দেশপত্রিকায়। পেয়েছেন “কান্দি নবীন সাহিত্য প্রতিভা পুরস্কার” এবং “জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্মারক পুরস্কার”। “লেখা ও রেখা” অ্যালবামটি তাঁর কবিতা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ধীরাজ চৌধুরীর একটি অনন্য সৃষ্টি ।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই ছেলেটা

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সুনীতা। এখান থেকে পার্কটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এখন দু একজন লোক ছাড়া পার্কে কেউ আসেনা। বৃদ্ধদের কিছু ভিড় থাকত। এছাড়া অল্পবয়সী কয়েকজন দৌড়তে আসত। ছোটদের ক্রিকেট খেলার দলটাও ভালোই দলবল সমেত হাজিরা দিত। এখন একেবারে ফাঁকা।

শুধু বেঞ্চে সেই ছেলেটা বসতে আসে। একদম একা। ওকে দেখতেই জানলার সামনে আসে সুনীতা। মার্চ মাসের পর থেকেই করোনার জন্য লকডাউন শুরু হয়েছে। সুনীতা বিগত কয়েক মাস বাড়ি থেকেই অনলাইনে অফিস করছিল। এখন আর পারছে না। কম্পিউটার খুললেই মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। মাইনে কাটবে। প্রাইভেট অফিস। যতই রেপুটেশান থাক, চাকরিটাও হয়ত থাকবে না। সে আর কি করা যাবে।

রাস্তায় লোক নেই বললেই হয়। কিন্তু তার মধ্যে ওইটুকু একটা বাচ্চা, বড়জোর বছর ছয়েক বয়স হবে। একা একা পার্কে কিভাবে আসে ?

জানলা থেকে সরে ভেতরের ঘরে এলো ও। টিভি চলছে। বিনোদ টিভির সামনে বসে আছে। কানে হেডফোন লাগানো। এই একটু আগেই বিনোদ ওঘরে গিয়েছিল। জানলার কাছে তখন ও দাঁড়িয়ে।

বিনোদ জানতে চায়। রোজ একই প্রশ্ন করে, "কি দেখছ?"

ও বলেনি। বলতে ইচ্ছে করেনি। আসলে বিনোদ আজকাল ওর কথা বিশ্বাস করেনা। মানে অবিশ্বাসের কথা একটাই। ও রোজ ছেলেটাকে যে দেখতে পায় সেই কথা।

একদিন বিনোদকে বলেছিল, "দেখবে, কি দেখি? আমি ওই ছেলেটাকে দেখি। ওই যে পার্কের বেঞ্চে বসে আছে।

"কে বসে আছে? কেউ নেই তো।"

"ওই যে হলুদ জামা আর নীল হাফ প্যান্ট পরা।"

"চল ভেতরে চল। আমরা সিনেমা দেখব এখন। মনুর মা আজ চপ বানিয়েছে। চপ খেতে খেতে দেখব। ভাল সিনেমা। চল।"

"দ্যুৎ! আমি যাবো না। আমি এখন সিনেমা দেখব না।"

বিনোদ সবসময় ভোলায় ওকে। ও যেন কিছু বোঝেনা। বিনোদ একেবারেই চায়না ও ছেলেটাকে দেখুক। তবে আর কথা বাড়ায়নি। জোর করেনি। আসলে সুনীতা চায়না এই ছেলেটার বিষয়ে আর কেউ জানুক। বিনোদ শুনলেও হেসে উড়িয়ে দেয়। নয়ত একেবারেই পাত্তা দেয়না। কিন্তু অন্যরা আলোচনা করবে তো।

এই করোনার সময়ে ওর সঙ্গে অনেক উলটো-পালটা ব্যাপার ঘটছে। বাড়ির সামনের বাগানে বেশ কিছু তুলসী চারা গজিয়েছিল। ও ভাবছিল কেউ চাইলে দিয়ে দেবে। অত রেখে লাভ কী? আর গতকালই ও দেখেছে সবগুলো চারা মরে গিয়েছে। এর পেছনে কি কোন কারণ আছে ? কে জানে?

এমনকি পাশের বাড়ির বেড়ালটা আগে কত ওদের বাড়ি আসত। একটা বাটিতে ওকে দুধভাত দিত সুনীতা। এখন একদম আসছে না। ওকে দেখলেও কাছে আসে না। মাথা নামিয়ে চলে যায়।

এসব কি এমনি এমনি ঘটছে ?

বারবার ও মনে করার চেষ্টা করে ছেলেটাকে প্রথম ও কোথায় দেখেছে। কিছুতেই মনে করতে পারেনা। লকডাউনের ঠিক আগে ও গাড়ি চালিয়ে বেরিয়েছিল একদিন। সংযুক্তার জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিল। সেখানেই কি ছেলেটাকে দেখেছিল ? না তাও তো নয়।

আসলে কিছুদিন হল ওর রাতে ঘুম হচ্ছেনা। বিছানায় শুলেই মন ছটফট করছে। রাতের এই ঘুম না হওয়ার জন্য বিনোদ ওকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গেল। ওনার ওষুধে এখনও তো কোন কাজ হল না। রোজ রাতে ওষুধ খেয়ে শোয়, আবার মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে। মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরছে। ওই ছেলেটাকে কোথায় কবে প্রথম দেখে ও। বড্ড চেনা মুখ! এত চেনা কি এমনি এমনি হয় ?

ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তাটা মাথা থেকে যাচ্ছে না। সেদিন রান্নাঘরে গ্যাসে কফির জল বসিয়ে ও ব্যালকনিতে এসেছিল। তখন বিকেল শেষ হব হব। আকাশের হলুদ আলো আস্তে আস্তে নিভে আসছে। গ্যাসে জল ফুটছে যে, একদম ভুলে গিয়েছিল। রান্নার মেয়েটি আসেনি। বাটি পোড়ার গন্ধ পেয়ে বিনোদ ওকে ডাকাডাকি করাতে ওর হুঁস হয়।

এসব মিলিয়ে বেশ গোলমাল শুরু হয়েছে। ও বুঝতে পারছে এই গন্ডগোলের মূলে আছে ওই ছেলেটা। যে বারবার ওকে দেখা দিচ্ছে। অথচ আর কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না।

আজ সকালেও ঘুম থেকে উঠতে পারেনি সুনীতা। কাল রাতে একটু বেশি দেরী করেই শুতে গিয়েছে। তখন তিনটে বাজে। একটা বই পড়তে পড়তে ও একদম বুঁদ হয়ে গেছিল। অনেকদিন বাদে অন্যমনস্ক হতে পেরে ভাল লাগছিল। ঠিক সেইসময় হঠাৎ করেই মাথায় এলো ওই ছেলেটার মুখ। সবটাই গোলমাল হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজেও জেগেছিল ও। বিনোদ ঠিকই টের পেয়েছে।

রাতে বাথরুম থেকে ফিরে ওর কাছ ঘেঁষে শুল। ও বুঝেছিল বিনোদ কি চাইছে। কিন্তু চেষ্টা করেও ওর তেষ্টা মেটাতে পারেনি। বিনোদ কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে গেল ওর কাছ থেকে।

আজকাল কি যে হয়েছে সুনীতার। কিছুই ভালো লাগছে না। করোনার প্রকোপে বাজার দোকান সব বন্ধ। খোলা থাকলেও আদৌ কতটা কি কেনাকাটার ইচ্ছে ওর হত কে জানে। দুদিন আগেই বিনোদ প্রায় জোর করে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মনোরোগের চিকিৎসক।

বললেন, "সাতবছর হয়ে গেল বাচ্চা চাইছেন না ?"

ও ঘাড় হেলিয়েছিল, "চাই তো। হচ্ছে না। সেই যে একবার নষ্ট হয়ে গেল, তারপর থেকে, ...।" এরপর উনি বিনোদের আর ওর দিকে ফিরে বললেন, "আন্তরিক ভাবে কি চাইছেন না আপনারা ? সমস্যাটা কি ? ম্যাডাম আপনি বলুন কোথায় আপনার অসুবিধা ? কি চিন্তা হয় ? মন খারাপ থাকে কেন ? বলুন। ওনার পরপর প্রশ্ন অসহ্য হওয়ায়, সেদিন উঠে পড়েছিল ও। বিনোদ বারবার বসতে বললেও বসেনি। উনি বললেন, "ঠিক আছে। আজ নিয়ে যান। এর পরের দিন পার্কের ছেলেটার গল্প আমাকে বলতে হবে কিন্তু।" খুব রাগ হয়েছিল ওর বিনোদের ওপর। দুদিন কথা বলেনি। যেকথা ও কাউকে বলেনি, সেই কথাটা ...। বলে দিল ? না ওকে আর কোনদিন বিশ্বাস করবে না।

# #

আজকাল কি যে হয়েছে, কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। দিন দিন এই ব্যাপারটা বেড়েই চলেছে। কেমন একটা ছটফটে ভাব। কি যেন করার আছে, বলার আছে, অথচ বলতে পারছে না। করতে পারছে না। বাড়ির কাজগুলো কিছুই করতে ইচ্ছে করেনা। রান্না করতে ইচ্ছে করেনা। স্নান করতে, সময়মতো খাওয়া দাওয়া করতে ভালো লাগেনা। কিসের যেন আলস্য পেয়ে বসেছে। সবসময় মনে হয় কাঁচের মত কুয়াশার একটা পর্দা ওকে ঘিরে আছে। সেই পর্দার ঘেরাটোপে ও একা আর অন্যদিকে বাকি পৃথিবীর মানুষ, চলমান জগৎ নিজের মত ঘুরে চলেছে।

করোনার প্রকোপে বিনোদ অনেকদিনই বাড়িতে বসে আছে।বাড়ি থেকেই অফিসের কাজ সারে অনলাইনে।ওর দৃষ্টি এড়িয়ে কোন কিছুই করা যায়না।ফলে ইচ্ছে না থাকলেও খাওয়া ঘুম সবই হচ্ছে ঠিকঠাক। যদিও ওর খেতে বসতে ইচ্ছে করেনা।একটু বেশি খেলেই বমি পায়।

সেদিন একটা গোলমাল হল। ডাক্তারের ওখান থেকে ফেরার পথে বিনোদ বলল "রাতে চশমায় আলো লাগলে আমার গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধা হয়। তুমি চালাবে আজ।"

ড্রাইভিং এ ওর হাত পাকা। তবু কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছিল। ও বলেছিল, "না না তুমি চালাও।" বিনোদ শুনল না।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই গোলমালটা হল। ঠিক পার্কের মোড়টায় স্ট্রিয়ারিংটা ঘুরে গেল একদম, আর গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মারল একজন সাইকেল আরোহী কে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল ও। চিনতে পেরেছে। সেই ছেলেটা। হলুদ জামা কালো প্যান্ট। কারোর সাইকেলের সামনে বসে যাচ্ছিল। ও জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছিল। ঝামেলার ভয়ে দাঁড়ায়নি। তারপর কি হয়েছে একটুও খেয়াল নেই ওর। সেদিন টেনশানে বাড়ি ফিরে অজ্ঞানও হয়ে যায়।

জ্ঞান হতে বিনোদ বলল, ও নাকি বিড়বিড় করে বারবার বলেছে "সেই ছেলেটা, আমি চিনতে পেরেছি। বারবার ওকে কেন ধাক্কা মারছি? ও মরে যাবে তো।"

দুদিন ও প্রায় বেহুস ছিল। গায়ে জ্বর, ব্যথা, কেমন যেন বেহাল অবস্থা। তারপর একটু ঠিক হতে পার্কের বেঞ্চের দিকে আবার তাকিয়েছিল ও। সেই ছেলেটাকে দেখতে পায়নি।

কদিন যেতে না যেতেই আবার আগের মত অবস্থা। দাঁড়াতে পারেনা অতক্ষণ, তাই চেয়ার টেনে বসে থাকে ব্যালকনিতে, ওই দিকে তাকিয়ে। কিন্তু না ছেলেটা আর বসে নেই পার্কের বেঞ্চিতে। ডাক্তার বাবুকে এবার বাড়িতে নিয়ে এলো বিনোদ। অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলেন উনি। যাবার সময় বললেন, "আপনার গল্পে একটা ভুল আছে মিসেস ব্যানার্জী। ওই ছেলেটা যাকে আপনি বারবার ধাক্কা মারেন সে মারা যায়নি। ওটা আসলে আপনার একটা ভুল ভাবনা। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আপনার।

কদিন হল আবার ও অফিস শুরু করেছে। বাড়ি থেকে। অনলাইন অফিস। সেদিন ডাক্তারবাবুকে বলে দেওয়ার পর একটাই অসুবিধা হয়েছে। ওই ছেলেটা আর আসছে না। তবে এটা ও বুঝেছে ডাক্তারবাবু মিথ্যে বলেছেন। উনি ওকে চিনবেন কি করে?

কদিন যেতে না যেতেই ছেলেটা আবার এসেছিল পার্কে। তবে দিনের আলোয় নয়। রাতে। সেদিন বিনোদ ওর বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। ও একা ছিল বাড়িতে। একা একা থাকলে কী যে হয়। কতকিছুই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে।

বিয়ের একবছরের মধ্যেই প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় ও। সেসময় চাকরিতে একটা প্রমোশান ডিউ হয়েছে। ও বিনোদকে বলেছিল, "এত তাড়াতাড়ি, এসময়ে, কিভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না। তুমি কি সাজেস্ট করো?"

"মানে, এব্যাপারে সাজেসানের কথা উঠছে কেন,তাই তো বুঝছি না। তোমাদের ফ্যামেলি আমাদের ফ্যামেলির সবাই এই খবরে খুশি। তুমি কি বলতে চাইছ আমাকে সোজাসুজি বলো।" একটু রেগেই গেছিল বিনোদ।

ঠিক তার দুসপ্তাহের মধ্যেই ঘটে ঘটনাটা। বাথরুমে পা স্লিপ করে ...। বিনোদ বলেছিল শুধু, "ভালোই তো হল। তুমি তো এটাই চেয়েছিলে।"

না ঠিক তখনই খারাপ লাগাটা আচ্ছন্ন করেনি ওকে। বছর পাঁচেক কেটেছিল ওভাবেই। দুজনের চাকরি, প্রমোশান, বন্ধুবান্ধব, বাবা মার আস্তে আস্তে মাথার ওপর থেকে খসে পড়া।

তারপর আবার আগের সমতলে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। ছবছরের মাথায় দেখা এক ভয়ংকর স্বপ্ন!

ঘুমের ঘোরে ও দেখে একটা বাচ্চা, ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। কোলে উঠবে। আর ও তাকে ফেলে দিচ্ছে। বারবার ঘটছে ঘটনাটা। ছ'বছর পরের সেই দিনটা ছিল সাতই সেপ্টেম্বর। দিনটা ও ভোলেনি। ঠিক ওইদিনেই ছ'বছর আগে ও বাথরুমে পড়ে যায়। ওর মিসক্যারেজ হয়। সেদিন রাতে ঘুমের ঘোরে চিৎকার করেছিল ও। তারপর কয়েকদিন ঘুমের ওষুধ খাওয়া, গভীর ঘুম। না আর কিছুই দেখেনি। সামলে গিয়েছিল তখনকার মত।

একটা অসম্ভব, অবাস্তব ঘটনা। এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন "আছে। অবচেতন মনের দরজা এভাবেই খোলে, তার কোন বাঁধাধরা সময় নেই। যখন যেমন ইচ্ছে হয় সে ঢাকনা খুলে দেয়। আমরা ভাবি কেন হচ্ছে? কী করে হচ্ছে?"

আবার শুরু হয়েছে অন্য পর্ব। ও পরিষ্কার দেখে বাচ্চাটাকে। একা পার্কে এসে বসে। ও ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে ঘাড় ঘুরিয়ে, একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ও হিসেব করে দেখেছে জন্মালে, বেঁচে থাকলে, সেই সন্তানের ওরকম বয়সই হত। আশ্চর্য সেবার না হয় ইচ্ছে ছিলনা। কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই ও ফিরিয়ে দেয়নি তো। কিন্তু তার পরে আর একবারও সুনীতা কনসিভ করল না কেন? অন্য সব কিছু নিয়ে এতই ব্যস্ততা যে এটা নিয়ে এতবছরে একবারও ভাবার সময় পেলনা?

# #

চারপাশে করোনা থাবা বসিয়েছে। রাস্তাঘাট শুনশান। তবু সুনীতাকে আনতে গাড়ি বার করছিল বিনোদ। সপ্তাহে দুদিন ও সুনীতাকে ড্রাইভ করে দিয়ে আসে,নিয়ে আসে। নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি একটা হোম আছে। বাচ্চাদের হোম। সুনীতা ওখানে পড়াচ্ছে। ওই হোমে সদ্য জন্মানো বাচ্চারাও আছে। তাদের মায়েরা জন্ম দেবার পর উধাও হয়েছে, আর কোন না কোন ভাবে সেইসব অসহায় বাচ্চারা পৌঁছে গিয়েছে ওই হোমে, আস্তে আস্তে বড় হয়েছে। ওদের পড়াতে যায় ও।

পার্কের ছেলেটা আর আসেনা। শেষ দিনে সে হাত তুলে বিদায় জানিয়েছিল সুনীতাকে। ও বোধহয় জেনে গিয়েছিল যে কদিন আগেই বিনোদের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। আর ও ফিরিয়ে দেবেনা। হোম থেকে নিয়ে আসবে তাকে, যে ওর কোলে উঠতে চেয়েছিল।

# #

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।বাড়িতে কেউ নেই। বিনোদের মামীমা হরিয়ানা থেকে এসেছেন। সপ্তাদু'য়েক ঘরবন্দী থেকে আজ মুক্ত হলেন। কথা বলতে পারবেন এবার। বিনোদ ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। অনেকদিন পরে আয়নার সামনে বসে ভ্রু তুলছিল সুনীতা। কতদিন পার্লারে যায়নি ও। মুখটা কেমন যেন অন্য রকম লাগে। আজ চেনা সুনীতাকে আয়নায় দেখাচ্ছে। কপালে দুই ভ্রুর মাঝে ছোট্ট একটা টিপ লাগিয়ে, গোলাপী ওড়নাটা কাঁধে ঝুলিয়ে, ঘুরে

ঘুরে দেখল নিজেকে। হঠাৎ কী মনে হতে ব্যালকনি দিয়ে উঁকি মারতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। ছেলেটা বসে আছে। ওর দাঁড়ানোটা টের পেয়ে হাসিমুখে ফিরে তাকাল। সুনীতার মধ্যে কী যেন উচ্ছৃঙ্খলতা কাজ করল হঠাৎ। চাবিটা হাতে নিয়ে ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। একছুটে রাস্তা পেরোতেই ছেলেটার কাছাকাছি। মিষ্টি হেসে দাঁড়াতেই কোলে উঠে পড়ল ছেলেটা। আশ্চর্য ! অতবড় একটা শরীর, একটুও ভারি লাগল না কেন ?

# #

খবর পেয়ে দ্রুত ফিরছিল বিনোদ। ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক ফ্ল্যাটের সামনে, রাস্তার ওপর। সামনের স্টেশনারি দোকানের ছেলেটা ফোনে বলল, "আপনি সোজা নার্সিংহোমে যান দাদা। গাড়ির চালকের কোন দোষ ছিলনা। বৌদি ফ্ল্যাটবাড়ির গেট খুলে কোন দিকে না তাকিয়ে একদৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তারপরেই ... ।"

বিনোদ পুরোটা শুনতে চায়নি। ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, ছেলেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই সুনীতার দেখা হয়েছে। ও তো চলে গিয়েছিল। তাহলে আবার ফিরে এলো কেন ?

# #

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকায়। ২০০১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

রাহুল রায়

অক্টোপাসের আত্মরক্ষা

এ আমার অল্প বয়সের গল্প। আগের জীবনে অল্প কয়েক বছর আমি ছিলাম এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ, বাংলায় যাকে বলে টিকটিকি, তার শাগরেদ। প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেই মুখে পাইপ, গায়ে টুইডের টপ কোট, মাথায় স্টাইলিশ টুপি-লাগানো শার্লক হোমস আর তার স্যাঙ্গাত ওয়াটসন কথা মাথায় আসে। বড় জোর সত্যজিতের ফেলুদা আর তোপসে। বিশুদা কিন্তু মোটেই সেরকম কিছু ছিল না।

আমাদের পাড়ায় দুটো বাড়ি পরে বিশুদা থাকতেন। আমার সাথে পরিচয় ছিল ভালোই। আর সেই সুবাদে উনি জানতেন যে আমি কলেজ পাস করে চাকরির ধান্ধায় আছি। পায়ের জুতোর সুকতলা খয়ে যাচ্ছে কিন্তু চাকরী জুটছে না। একদিন তিনি বললেন – "তোর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে যতোদিন না তুই চাকরি পাচ্ছিস ততোদিন আমার সাথে কাজ কর। টাকা-পয়সা কিছু পাবি। সেটা পকেট – ফাঁকা বেকার হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভাল। বলা যায় না হয়তো এ লাইনের কাজ তোর ভালো লেগে যেতেই পারে"।

আমি তো ভারি খুশি। অল্প হলেও টাকাকে-টাকা জুটবে, যাতে অন্ততঃ হাত-খরচের টাকাটা উঠবে, আর এক নতুন ধরণের কাজও শেখা যাবে।

তখনই আমি জানলাম যে বিশুদা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। একদিকে কোনান ডয়েল, আগাথা কৃষ্টি, অন্যদিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সত্যজিত রায় পড়ে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে গোয়েন্দাগিরি করা কোন চাকরি হতে পারে না, নেহাতই সখের ব্যাপার। তাদের নামডাক শুনে লোকজন হাজির হয় তাদের কাছে নানান রহস্যের সমাধানে। বিশুদার সাগরেদ হওয়ার পর জানতে পারলাম হয়তো সাধারণ অর্থে চাকরি বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়, কিন্তু এটাও একটা পেশা। এই করে লোকে ঘর-সংসার চালাতে পারে। কারণ বিশুদার বৌ-ছেলে-মেয়ে সবই ছিল, খালি সকাল বেলায় ছুটতে-ছুটতে বাস ধরে চাকরিতে যেতে হত না।

বিশুদার চেহারা, হাবভাব কোন দিক থেকেই আমার চেনা ডিটেকটিভ-দের সাথে মেলানোর কোন সম্ভাবনাই নেই। চেহারায় অতি সাধারণ বাঙালি। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ, মাথায় প্রায় সাড়ে পাঁচ, বেশ রোগা-পটকা যাতে প্যান্ট-শার্ট কেমন যেন ঝুলে-ঝুলে থাকে। এক কথায় চেহারায় পাঁচজনের থেকে আলাদা করে চেনা অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে তিনি মোটেই সাধারণের পর্যায়ে পড়তেন না, যার পরিচয় পেতে আমার খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। কাজ শুরু করার অল্প পরেই জানতে পারি টিকটিকি-দের জগতে বিশুদার বিরাট নাম-ডাক। পুলিশের মধ্যেও কিছু কম নয়। কোন কেসের সমাধান না করতে পারলে পুলিশের অফিসাররা বিশুদার দরজায় কড়া নাড়ে। আবার মাঝে মাঝে কোর্টেও যেতে হয় সাক্ষী দিতে। তা ছাড়াও আছে নানান প্রাইভেট ক্লায়ান্ট। তারা নাকি মোটা টাকা দেয়।

কোন কারণে বিশুদার আমাকে পছন্দ হয়ে যায়। তাই প্রায়ই বলেন, "আমাদের লাইনের সব কিছু মারপ্যাঁচ তোকে শেখাতে চাই, কিন্তু তাতে লাভ হবে কী? এতে কি তোর মন টিকবে? একদিন চাকরি পেলেই তো ফুরুৎ করে পাখি উড়ে যাবে।"

কিন্তু মুখে যাই বলুন সুযোগ পেলেই তিনি আমাকে এই লাইনের নানান ফন্দি-ফিকিরে হাতে-খড়ি দেন। আমায় সঙ্গে নিয়ে যান কোন কোন কেসে। খালি বলেন – "ভগবান আমাদের দুটো কান, দুটো চোখ, দুটো নাকের ফুটো দিয়েছেন। কিন্তু মুখ দিয়েছেন একটা। তাই সবকিছু দেখতে হবে, শুনতে হবে, দরকার হলে শুঁকতেও হবে, কিন্তু কথা বলতে হবে কম।"

তাই আমি চুপ করে শুনতাম, দেখতাম। আর, এইভাবেই আমি বিশুদার হাতে ডিটেকটিভ হওয়ার ট্রেনিং পেয়েছিলাম। দেখতাম উনি কিভাবে যে কোন কেস লোকজন, পরিস্থিতি সবদিক দিয়েই বিশ্লেষণ করেন। আর এসব দিয়েই তিনি আসামিকে ঠিক টেনে বার করেন। মাঝে-মাঝেই আমায় জিজ্ঞাসা করেন – "তুই আমার জায়গায় থাকলে কী করতিস?" প্রথম দিকে আমি আমতা-আমতা করতাম, কিন্তু পরে, কনফিডেন্স বেড়ে গেলে আমি ভালোভাবে চিন্তা করে উত্তর দিতাম। তাতে প্রায়ই আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন – "বা:, এইতো বেশ শিখছিস।"

কতরকম কেসই যে আসত বিশুদার কাছে। কে কার কাছে টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় নি তাকে খুঁজে বার করে টেনে আনো, কাকে কোন গাড়ি ধাক্কা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে তার ড্রাইভার, মালিক ইত্যাদিদের খুঁজে বার করো, কার বৌ কোন পুরুষের সাথে ফস্টি-নস্টি করছে, আর সেই বৌয়ের পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকো। এসবের কেস বিশুদা কিছুটা আমার হাতে ছেড়ে দিতেন। বলতেন – "এসব হল ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা।" কিন্তু তার পরেই বলতেন – "না:, সব কিছু থেকেই শেখার আছেরে। ওপরে-ওপরে সাধারণ মনে হলেও কোন কোন কেসের মধ্যে ঢুকলে দেখতে পাবি নানারকম সব গন্ডগোল, নানান গলি-ঘুঁজি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে সব কিছু থেকেই তোকে শিক্ষা নিতে হবে। তবেই তুই নিজে একদিন নামকরা গোয়েন্দা হতে পারবি। অবশ্যই তুই যদি তা হতে চাস।"

আমি যে কী চাই তা ঠিক জানতাম না। চুপ করে শুনতাম। ছোটছোট কেস ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতাম। তবে জটিল কোন কেস, বিশেষ করে মার্ডারের কেসে আমায় হাত দিতে দিতেন না। বলতেন – "না:, এসব হল আমাদের লাইনের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং। এ গুলোয় হাত দিতে গেলে যে ম্যাচিওরিটি দরকার, তা তোর এখনো হয় নি।"

বছর দুয়েক কেটেছে। ছোট-ছোট কেস নিয়ে হাত পাকাচ্ছি। এমন সময় একদিন বিশুদা আমায় ডেকে বললেন –

– "আমার হাতে একটা মার্ডার কেস এসেছে, আমি তোকে সঙ্গে নিতে চাই।"

– "মার্ডার কেস? আমায় নিয়ে যাবে?" আমি ভীষণ উত্তেজিত।

– "তাই ভাবছি। এইভাবেই তোর মার্ডার কেসে হাত-খড়ি হোক। এইভাবেই ইয়ু জয়েন দ্য র‍্যান্ক্স অফ ট্রু ডিটেকটিভস।"

তারপর একটু থেমে বললেন – "পুলিশে যা বলল তাতে আপাত:দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সোজাসুজি ব্যাপার। মার্ডার অফ প্যাশন, বৌ অন্য লোকের সাথে ঘুরছিল। স্বামী তাকে খুন করে হাওয়া। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় অনেক সময় যে কেসগুলো প্রথমে সোজা বলে মনে হয়, সেগুলোই পরে বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, দেখা যাক, এই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

পুলিশ থেকে বিশুদাকে খবর দিয়েছে যে সেদিন সকালেই মার্ডারটা হয়েছে। বিশুদা যদি তাড়াতাড়ি আসেন তাহলে ভাল হয়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা দুজন আমাদের প্রতাপাদিত্য রোডের বাসা থেকে শহরের উত্তরে রাইচাঁদ মল্লিক লেনে ক্রাইম সীন-এ হাজির।

মস্ত এক পুরনো বনেদী বাড়ি, তবে বেশ হাড়-জিরজিরে অবস্থা। সামনে বাড়ির মতই বহুদিনের যত্ন না-পাওয়া বাগান। ঢুকেই বোঝা যায় যে এই বাড়ির এক সময় সুদিন ছিল। এখন সময়ের সাথে তাল রাখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ার অবস্থা।

সারা জায়গাটা পুলিশে-পুলিশে একেবারে ছয়লাপ। এর মধ্যে থেকে স্থানীয় থানার ও-সি বিশুদাকে দেখেই এগিয়ে এলেন।

– "যাক, আপনি এসে গেছেন। আমি কিছুটা প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশন করেছি। স্বামী-স্ত্রী আর পুরনো কাজের লোক নিয়ে সংসার। স্বামী কাজের জন্য প্রায়ই বাইরে থাকে। আর তার স্ত্রীই খুন হয়েছেন। এই হল ঘটনা। কে বা কারা খুন করেছে, কেন করেছে – তা কিছুই জানা নেই আপাততঃ।"

– "হুন, ব্যাপার বুঝলাম। সেই স্বামী এখন কোথায়?"

– "কাজের লোকের কথায় সে কদিন কাজে বাইরে রয়েছে। বহরমপুরের একটা ঠিকানা দিয়েছে। মোবাইলের নাম্বারও দিয়েছে। কিন্তু সেই ফোন কেউ ধরছে না। সেইজন্য আমরা খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছি। এখনও কিছু জানি না।"

তারপর একটু থেমে বললেন – "আমার কাছে ব্যাপারটা সোজা বলে মনে হয়নি। তাই আপনাকে ডাকা।"

– "ঠিক আছে। আপনারা আরম্ভ করুন। আমিও আরম্ভ করি আমার মত।"

ও-সি ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে – এই বাচ্চা ছেলেটা এখানে কেন? – মার্কা একটা দৃষ্টি দিলেন।

তাতে বিশুদা তাকে আস্বস্ত করে বলে উঠলেন – "এ অনুপম, আমার কাছে কাজ শিখছে। কোন অসুবিধে নেই।"

– "যাক, তাহলে ঠিক আছে। এসব মার্ডার সীনে বাইরের লোক না থাকাই ভাল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা মাঝে-মাঝে উল্টোপাল্টা রিপোর্ট করে আমাদের বিপদে ফেলে। চলুন খুনের জায়গায় যাওয়া যাক।"

আমরা সিঁড়ি ধরে দোতলায় গেলাম। বাড়ির বাইরেটা যেরকমই হোক না কেন ভেতর বেশ দামী ও সুন্দর জিনিষ-পত্র দিয়ে সাজানো-গোছানো, যা দিয়ে বাড়ির মালিকদের অতীতের বিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আগে-আগে ওসি ভদ্রলোক চলেছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ঘুরতেই শোওয়ার ঘর। জানলা দিয়ে সকাল এগারোটার আলো এসে পড়েছে। দেখা গেল সেই ঘরের মেঝেতে আপাতমস্তক কাপড়ে ঢাকা দেওয়া মৃতদেহটা শুয়ে আছে। সারা মেঝে চাপ-চাপ রক্ত কালো হয়ে এসেছে, কয়েকটা মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা আঁশটে গন্ধে বাতাস ভারি।

বিশুদাকে দেখাতে ওসি ভদ্রলোক শরীরটা চাপা দেওয়া চাদরটা খুলে দিতেই বিশুদা ও আমার গলা দিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়ার একটা চাপা আওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এল। ভদ্রমহিলা অসামান্যা সুন্দরী। একেবারে দুর্গা প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কাঁচা হলুদ গায়ের রং, ঘন কালো কোঁচকান চুলের একটা অংশ মুখের ওপর এসে পড়েছে। আর সেই মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন একেবারে সুস্পষ্ট। পরনের ছিন্নভিন্ন শাড়ি প্রায় কোমর অব্দি তোলা। ছেঁড়া ব্লাউস আর ব্রাসিয়ার পাশে পড়ে। গলার নলী ধারালো কিছু দিয়ে গভীর ভাবে কাটা। সেখান দিয়ে তখনো অল্প-অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

– "খুন করার আগে ভদ্রমহিলাকে নৃশংস ভাবে রেপ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।" – ওসি বলে উঠলেন।

– "হুন, আর ভদ্রমহিলা যে বাধা দিয়েছিলেন তাও বোঝা যাচ্ছে।"

– "আর খুলে রাখার প্রয়োজন আছে?"

– "না, আমার যা দেখার তা দেখে নিয়েছি। আপনি ঢাকা দিয়ে দিন।

বিশুদার এই কথায় ওসি যত্ন নিয়ে চাদর দিয়ে দেহটা ভালোভাবে ঢেকে দিলেন।

– "যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে, তা কি পাওয়া গেছে?" বিশুদা বললেন।

– "না, তা এখনো নিখোঁজ। আমার লোক বাড়ির বাইরের বাগান ভালোভাবে খোঁজ করেছে। সেখানে কিছু পাওয়া যায় নি।"

– "ঠিক আছে। আমি ওখানে একটু ঘুরে দেখব। কিন্তু তার আগে আমি এই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

– "কথা বলতে পারেন এমন লোক বলতে বাড়ির বহুদিনের বিশ্বস্ত কাজের লোক মানদা। অন্য ব্যক্তি ভদ্রমহিলার স্বামী, দিবানাথ চৌধুরী। আগেই বলেছি তিনি কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই বাইরে থাকেন, সেদিন ও ছিলেন। এদের কোন সন্তান নেই।"

– "ঠিক আছে তাহলে মানদাকেই ডাকুন। কিন্তু তার আগে আপনি যে করেই হোক ভদ্রমহিলার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। জানেনই তো এ ধরণের মার্ডারে স্বামীই প্রধান সাসপেক্ট। বিশেষ করে সুন্দরী মহিলাদের নিয়ে সমস্যা আরও বেশি।"

ইতিমধ্যে অন্য এক পুলিশের সঙ্গে মানদা ঘরে এসে হাজির। এসেই হাঁউ – মাউ কান্না – আমি কিছু জানিনা, আমি কিছু দেখিনি। ইত্যাদি।

ওসি অল্প ধমক দিয়েই তাকে থামিয়ে বললেন – মিছিমিছি চেঁচামেচি করে আমাদের সময় নষ্ট কোর না। কেউ বলছে না যে তুমি কিছু করেছ। তুমি এই পরিবারে অনেকদিন আছ। তাই আমরা জানতে চাই তুমি এদের সম্বন্ধে কী জান। তাছাড়া সেদিন কী হয়েছিল, তুমি কোথায় ছিলে, কী দেখেছ, ইত্যাদি।"

মানদা, মানে মাথায় কাঁচাপাকা চুল, আনুমানিক ৬০-৬৫ বছরের এক ভদ্রমহিলা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিশুদা তার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বললেন।

– "কতদিন আছ এই পরিবারে?"

– "আজ্ঞে, তা তিরিশের বছরের বেশি হতে চলল। আমি দাদাবাবুর বাবার আমলের লোক। দাদাবাবু আমার হাতেই প্রায় মানুষ।"

– "তুমি তাহলে দিবানাথবাবুর বিয়ে-টিয়ে সবই দেখেছ?"

– "দেখব না মানে। তখন বড়বাবু, বড়মা বেঁচে। কতো ধুমধাম, কতো লোকজন। আমাকে ওঁরা আমাকে তো এই পরিবারের একজন বলে মনে করতেন।"

এরপর মানদা বেশ একটু থেমে, দম নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে – "তারপর এক-এক করে তাঁরা চলে গেলেন। এদেরও ছেলেপুলে কিছু হল না। দাদাবাবুও কাজের জন্য প্রায়ই বাইরে থাকে। মাঝে-মাঝে ভাবি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু কোথায় যাব? কবে গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছি। সেখানে বিশেষ কিছু নেই যে ফিরে যাব।"

– "আর তোমার বৌদির সম্বন্ধে বল।"

মানদা চুপ। বিশুদা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। এতক্ষণে যেন একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে।

– "তোমার বৌদিমনি বা মিসেস মালতী চৌধুরী কেমন লোক ছিলেন?"

তাতে মানদা তাড়াতাড়ি বলে উঠল – "না, না, দিদিমনি খুবই ভাল লোক ছিলেন। আমাকে খুবই পছন্দ করতেন।"

– "আর তোমার দাদাবাবু, বা দিবানাথবাবু? তিনি তো প্রায় তোমার হাতেই মানুষ। তাই না?"

– "হ্যাঁ। এক সময় তো আমার খুবই ন্যাওটা ছিল। কিন্তু –।"

– "কিন্তু কী?"

– "বড় হয়ে কুসঙ্গে পড়ল। বড়মা তখন চলে গেছেন। আমি অনেক বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ততোদিনে আমি বাড়ির পুরনো কাজের লোক হয়ে গেছি। আমার কথা কে শোনে।"

– "তোমার দাদাবাবুর সাথে তোমার বৌদির সম্পর্ক কেমন ছিল?"

মানদা আবার চুপ। বিশুদা এবার বেশ কঠোর ভাবে বললেন – "এটা জানা আমাদের প্রয়োজন।"

মানদা হাঁউ-মাউ করে উঠল – "আমায় এসব জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি মুক্ষু-সুক্ষু, গরীব মানুষ। কী কথা বলতে কী বলব।"

– "তুমি মুক্ষু-সুক্ষু হতে পার। কিন্তু এত বছর এই বাড়িতে আছ। তুমি সবই জান।"

গলার ভদ্রতার স্বর ঝেড়ে ফেলে বিশুদা চাপা গলায় প্রায় হিস-হিস করে বলে উঠলেন – "বলো"।

– "বলছি, বলছি। বিয়ে হওয়ার প্রথম বছরদুয়েক সব ঠিক ছিল। তার পরেই সব কিছু কেমন পালটাতে শুরু করে। দুমাসের অন্তরে বড়বাবু আর মা চলে গেলেন, আর এ বাড়ির অবস্থাও পড়তে শুরু করল। আমাকে তো কেউ সোজাসুজি বলেনি, কিন্তু কানাঘুষোয় শুনতে পেতাম যে দাদাবাবুদের পৈতৃক ব্যবসা পড়তির দিকে।"

– কিসের ব্যবসা?

– "নানারকম ব্যবসা। ইঁট-কাঠের দোকান থেকে তেজারতির কারবার। সবই কানাঘুষায় জানা। তাছাড়া।"

– তাছাড়া কী ?

এই প্রশ্নে মানদা সত্যি-সত্যিই হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

– "আমাকে এসব নোংরা কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।"

বিশুদার মুখের পেশির একটুকুও পরিবর্তন হল না। যেন তিনি এটাই আশা করছিলেন। আবার হিস-হিসিয়ে উঠলেন।

– "ব্যবসার অবস্থা পড়ে যেতে তিনি বৌদিকে ভাড়া খাটাতে শুরু করলেন। তাই না?"

মানদা খুব ক্ষীণ গলায় বলল – "হ্যাঁ"।

– "ঠিক আছে। তুমি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছ। আর একটু আছে। সেটা করেই আমি তোমায় ছেড়ে দেবো।"

মানদা ঘাড় নেড়ে বলল – "ঠিক আছে।"

– "গতকাল সন্ধ্যে থেকে রাত অব্দি ঠিক কী-কী হয়েছিল বলো।"

– "দাদাবাবু বাইরে। আমি আর বউদিদিমণি রাতের খাবার খেয়েছি প্রায় দশটায়। তারপর আমি বাইরের দরজা বন্ধ করে শুতে গেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা।"

– "এর পর তুমি সন্দেহ করার মত কিছু দেখ নি বা শোন নি?"

– "না বাবু। আমার ঘুম বয়সের সাথে-সাথে বেশ পাতলা হয়ে গেছে। কোন আওয়াজ হলে আমি ঠিক শুনতে পেতাম।"

– "তোমার ঘুম পাতলা। বাড়িতে খুন হয়ে গেল, অথচ তুমি কিছু শুনতে পেলেনা, জানতে পারলে না?"

– "না বাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানতে পারিনি। সকালে উঠে আটটা নাগাদ বউদিদিমনিকে চা দিতে গিয়ে দেখি এই অবস্থা। নিজেকে কিছুটা সামলে নেওয়ার পর পাড়ার ছেলেদের বলি পুলিশকে খবর দিতে।"

– "এখন যাও। তবে তোমাকে আমি পরে আবার ডাকব।"

"মানদা চলে গেলে বিশুদা ওসি-র দিকে তাকিয়ে বললেন – "

"ফরেনসিকের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছেন। মিসেস চৌধুরীর শরীরে, জামাকাপড়ে ফিঙ্গার-প্রিন্ট ইত্যাদি সব আইডেন্টিফাই করার ব্যবস্থা করুন। আমি একটু বাড়ির বাইরেটা ঘুরে আসছি।"

এই বলে আমাকে "চল" বলে টেনে নিয়ে বাইরে চলে এলেন।

আগেকার দিনের পুরনো বনেদী বাড়ি। এখান-ওখান ভেঙ্গে পড়লেও এখনও একটা উঁচু পাঁচিল মাথা তুলে রয়েছে। ভিতরে আম-জাম, নারকোল জাতীয় বড় গাছ ছাড়াও ফুলের গাছের ঝোপও কিছু রয়েছে। তবে সবই আগাছায় ভর্তি। ভয় হয় সাপ-খোপ থাকলেও থাকতে পারে। দোতলার শোয়ার ঘরে যেখানে মালতী খুন হয়েছেন তার কাছে-পিঠে গাছ-পালা কিছু নেই। সেসব বেয়ে ঘরে ঢোকার সুযোগ নেই। তাছাড়া পুরনো বাড়ি বলে দোতলা বেশ উঁচুতে।

এতক্ষণে বিশুদা মুখ খুললেন – "তুই বোধহয় আমার সাথে একমত হবি যে বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢোকার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

– "হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে। কিন্তু গতকাল রাতে যে বা যারা এসেছিল তারা বাড়িতে ঢুকেছিল কিভাবে? মানদা তো বলল যে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ও জেগে ছিল।"

– "হ্যাঁ, সেটা ভাবার কথা।"

(২)

দুদিন বাদে সেই ও-সি ভদ্রলোক বিশুদার কাছে ফরেনসিক রিপোর্ট নিয়ে হাজির। মিসেস চৌধুরীর শরীরে নিজের ছাড়া অন্য কারোর হাতের ছাপ পাওয়া যায় নি।

– "হাতে গ্লাভস পরে খুনটা করেছে। প্রি-মেডিটেটেড মার্ডার।"

– "নিঃসন্দেহে, তবে পাওয়ার মধ্যে ঘরে একটা সিগারেটের বাট পাওয়া গেছে। আমরা দিবানাথের ফিঙ্গার-প্রিন্ট তার ব্যবহার করা জামাকাপড় থেকে পেয়েছি।"

– "তার সঙ্গে মিলছে না। তাই তো?"

– "এক্কেবারে ঠিক।"

এই বলে বিশুদা পকেট থেকে সাবধানে কাগজে মোড়া কী একটা বার করলেন। "এই সিগারেটের বাটটা বাইরে ঝোপের মধ্যে পেয়েছি। আমি নিশ্চিত অন্যটার সঙ্গে মিলে যাবে।"

তারপর একটু থেমে বিশুদা জিজ্ঞাসা করলেন – "হাসব্যান্ডের কোন খোঁজ মিলল?"

– "এখনো পর্যন্ত না।"

– "আপনাকে যে মানদার গ্রামের বাড়ির ব্যাপারে খোঁজ করতে বলেছিলাম – তার কিছু হল?"

ভদ্রলোককে চিন্তিত মনে হল। "মানদা যে বলছিল যে তার গ্রামের বাড়ির বিশেষ কিছু নেই, তা সত্যি নয়।"

বিশুদা থামিয়ে দিয়ে বললেন – "আমি জানতাম। আর অবস্থা বেশ ভাল। তাই তো?"

– "হ্যাঁ, আপনি একশো ভাগে ঠিক।গ্রামের লোকেরা বলল বছর দুয়েক ধরে সেই বাড়ির ভোল বেশ পালটেছে।"

– "তাই আশা করেছিলাম। আপনি মানদাকে থানায় রাখার ব্যবস্থা করুন। আর দিবানাথকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

– "ঠিক আছে। আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না। কিন্তু সে এখনও ফেরার।"

সেদিন সন্ধ্যায় বিশুদা আমায় নিয়ে পড়লেন। "দেখি, সব দেখে, বুঝে তোর অভিমত কী।"

– "কতোগুলো ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার নয়। হয় খুনী বাড়িতে আগে থেকে লুকিয়েছিল, অথবা খুনের রাতে তাকে বাড়িতে কেউ ঢুকিয়েছিল।"

– "ঠিক। কে তাকে লুকিয়ে রেখেছিল বা ঢুকিয়েছিল বলে তোর মনে হয়?"

– "মানদা।"

বিশুদা খুব খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন – "এক্কেবারে ঠিক। দিবানাথ তার বৌয়ের শরীর বেচে বাড়ি থেকে যে ব্রথেল চালাত মানদা ছিল সেই পতিতালয়ের মাসী। আর তার জন্য যে টাকাপয়সা পেত তাই দিয়ে গ্রামের বাড়ির রমরমা। সেদিন আমাদের সে দু-মুখে মিথ্যে কথা বলেছে।"

– "সত্যি। কিন্তু সে-ই তো এই মধুচক্রের কথা আমাদের কাছে ফাঁস করেছে। কেন?"

– "সেটা নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য। সে জানত যে খবরটা একসময় বেরিয়ে পড়বেই পড়বে। এটা এক ধরণের প্রি-এম্পটিভ স্ট্রাইক।"

একটু থেমে বিশুদা বলল – "তাহলে তোর মতে কে খুন করেছে মিসেস চৌধুরীকে?"

– "দিবানাথ চৌধুরী। আর নিজেকে ঢেকে রাখতে অন্যের সিগারেটের বাট খুনের জায়গায় রেখে, বাইরে ঝোপে ফেলে রেখে সবাইকে কনফিউস করার চেষ্টা করেছে। যাকে বলে প্ল্যান্টেড এভিডেন্স?"

আমার উত্তরে বিশুদা খুব খুশি। "আমার এতদিনের ট্রেনিং তাহলে বিফলে যায় নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অঙ্কটা ঠিক মেলাতে পারছি না।"

– “কী অঙ্ক?”

– “নিজের বৌয়ের শরীর বিক্রি করে দিবানাথ চৌধুরী তো বেশ ভালই ছিল। সে হঠাৎ তাকে খুন করে তার রোজগার বন্ধ করতে যাবে কেন? সত্যি কথা বলতে কী আমি প্রথমে যেটাকে সেক্সুয়াল অ্যাসালট বা রেপ বলে মনে করেছিলাম সেটা বোধহয় সত্যি নয়। জামা-কাপড় ছিঁড়ে সেটাকে রেপ বলে চালানোর চেষ্টা।”

– “এক্কেবারে ঠিক। আর এই একই কারণে মানদা খুনী হতে পারেনা।” আমি বলে উঠলাম।

– “বাঃ, এক্কেবারে ঠিক লজিক। কিন্তু দিবানাথ ও মানদা যদি খুনী না হয়, তাহলে কে সে?”

এরপর বিশুদা অনেকখানি থেমে বললে –“এই ধাঁধার উত্তর দিবানাথের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। ও-সি ভদ্রলোক আমায় কিছু খবর দিয়েছেন। থানায় চাপে পড়ে মানদা বেশ কিছু কথা বলেছে। সে বলেছে শেষের দিকে মিসেস চৌধুরী প্রটেস্ট করতে শুরু করেছিলেন। ইদানীং তাদের মধ্যে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হত। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে।

আমি নড়ে-চড়ে বসলাম – “আবার কী ব্যাপার?”

– “মানদা জেরার মুখে অনেক কথা বলেছে।” বিশুদা একটা সিগারেট ধরালেন। আস্তে-আস্তে, লম্বা টানে সিগারেটটা শেষ করে কথা শুরু করলেন।

– “মানদা ঠিক বলতে পারে নি। কিন্তু সে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে দিবানাথ সম্প্রতি একটা বে-আইনী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। আমি একটু খোঁজ নিয়েছি। আমার মনে হয় দিবানাথ ইদানীং ড্রাগ-ট্রাফিকিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।”

– “ওরে বাবা, সে কী?”

– “হ্যাঁ। ব্যবসাতো ভাল চলছিল না। তাই নিজের সুন্দরী বৌকে হাই-পেইড বেশ্যা বানিয়ে, আর ড্রাগ-ট্রাফিকিং করে জীবন যাপন। এই আর কী।” বিশুদা একটু থেমে, গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন।

– “এই ব্যাপারটা বোধহয় মিসেস চৌধুরী জানতে পারেন। মানদা স্বামী-স্ত্রীর অনেক কথা কাটাকাটি, এমন কী আমার মনে হয় মার-ধোরের ও সাক্ষী। সে বলেছে যে ইদানীং মালতী চৌধুরী তার স্বামীকে শাসাতে শুরু করে যে তাকে জোর করে শরীর বিক্রির ব্যবসা বন্ধ না করলে সে পুলিশের কাছে তার বে-আইনী কাজের ব্যাপারটা বলে দেবে।”

– “ওরে বাবা, এতো সাপের ল্যাজে পা দেওয়া।”

– “একেবারেই। আর সেই জন্যই মিসেস চৌধুরীকে খুন হতে হল। এক অত্যন্ত ধূর্ত, বেপরোয়া ও ডেঞ্জারাস লোক এই দিবানাথ। আর আমাদের প্রধান কাজ তাকে খুঁজে বার করা, অ্যান্ড ব্রিং হিম টু জাস্টিস।”

– “কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা দিবানাথকে খুনি বলে সাব্যস্ত করলে কী হবে ফরেনসিক রিপোর্টে তো এখনো তার কোন এভিডেন্স নেই। তাহলে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?”

– “পুলিশের রিপোর্টে কী আছে তাতো সে জানে না। ধরে নিয়েছে যে পুলিশ তাকে খুঁজছে। আর আমি বা আমরা যে কে, বা আমরা যে তার ব্যাপার-স্যাপার আন্দাজ করে নিতে পেরেছি, সে কথা সে আদৌ জানে বলে মনে হয় না। পুলিশের ঝামেলা হবে বলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।”

– “তাহলে আমাদের কাজ দিবানাথ চৌধুরীকে যে ভাবে হোক খুঁজে বার করা।”

– “একেবারেই।”

(৩)

কয়েকদিন পর বিশুদা আমায় বললেন – "অনেক চেষ্টার পর দিবানাথের সাথে কাল মোবাইলে কথা হল। বেশ ঘোড়েল লোক বলে মনে হয়।"

– "তুমি কি নিজের পরিচয় দিলে?"

– "পাগল, তাহলে সে আমার সঙ্গে দেখা করে? বলেছি আমি এক লোকাল ড্রাগ ডিলারের কাছ থেকে আসছি। তাতেও সে দেখা করতে চায় না। অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। চল, আমাদের এক্ষুনি রানাঘাট যেতে হবে। ওখানে একটা ঠিকানা দিয়েছে। সেখানে মীট করতে চায়।"

ট্রেনে সারা রাস্তা বিশুদা গভীর চিন্তায় মগ্ন। একসময় আমাকে বললেন – "সাবধানে থাকবি। এ লোক ভাল নয়। আমিও প্রটেকশন নিয়েছি।" এই বলে গোপনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখালেন যে সঙ্গে একটা ছোট্ট পিস্তল রয়েছে।

দিবানাথ যে ঠিকানা দিয়েছিল তা শহরের বেশ একটু ফাঁকা জায়গায়। ছোট্ট ইঁটের বাড়ি, বিশেষত্ব কিছু নেই। মোবাইলে দিবানাথকে ফোন করে বিশুদা এক হাত কলিং বেলে চাপ দিয়েছে, ডান হাত পকেটে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হঠাৎ দরজা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বোমার ঝলকানি, ঘন ধোঁয়া, আর বিকট আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার যোগাড়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন হল আমি হাসপাতালে শুয়ে আছি. আমার এক চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। প্রচন্ড ব্যথা। জানতে পারলাম আমার ওই চোখ বম্ব-ব্ল্যাস্টে নষ্ট হয়ে গেছে। আর বিশুদা? বেঁচে নেই।

(৪)

মালতি হত্যা-রহস্য অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ভাল হয়ে উঠে আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিবানাথ চৌধুরীকে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। দিবানাথ কর্পূরের মত হাওয়ায় উবে গেছে।

এদিকে আমার টিকটিকি জীবনেরও ওখানেই শেষ। বছরখানেক পর ছোট-খাটো একটা সরকারী চাকরি পেয়ে যাই। সেই চাকরিতেই রিটায়ার করে বর্তমানে বাড়িতে অবসর-জীবন যাপন করছি। বিয়ে-থা করিনি। মাঝে-মাঝে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা আর টি-ভি দেখে দিন কাটে।

আজ দেখি টি-ভি-তে অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড সীরীজে জলচর জীব-জন্তু দেখাচ্ছে। দেখি অক্টোপাসদের কথা হচ্ছে। সব জলচর জীব হিংস্র নয়, কিন্তু আপাতঃ শান্ত অক্টোপাস তাদের মধ্যে পড়ে না। ছোটখাটো, কেমন গোলগাল দেখতে, আবার ছোট ছোট চাকা-চাকা দাগ লাগানো শুঁড়ও আছে আটখানা। তবে ছোট বেলায় পড়া জুল ভার্নের – "টোয়েন্টি থাউসাণ্ড লীগস আন্ডার দ্য সী" গল্পের সেই বিশাল ও বীভৎস, আটটা শুঁড় দিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করার জন্তুর সাথে এর কোন সম্পর্কই আছে বলে মনে হচ্ছে না। নিতান্তই কল্পনা – আমি ভাবলাম।

হঠাৎ সমস্ত স্ক্রিনটা ঘন নীল। ন্যারেটর বলে চলল – অক্টোপাসরা যখন ভয় পায় তখন তারা শরীরের একটা গ্ল্যান্ড থেকে এই নীল রং ছড়িয়ে শত্রুর কাছ থেকে আত্মগোপন করে। আর সুযোগ পেলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হঠাৎ আমার মাথায় অনেক বছর আগের সেই অমীমাংসিত মালতি হত্যা-রহস্যের কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। তাহলে কি দিবানাথ বুঝতে পেরেছিল যে বিশুদা জানে যে সে নিজেই স্ত্রীকে খুন করেছে, আর দুটো সিগারেটের বাট ঘটনাস্থলে রেখে ব্যাপারটা জটিল করার চেষ্টা করেছে ? তাই ওই অক্টোপাসের মত বম্ব-এর ধোঁয়ায় পিছনে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল? তবে নীল রঙের চেয়ে বম্ব-এর ধোঁয়া ছিল অনেক বেশি হিংস্র।

শখের টিকটিকি হওয়াটা যেন একটা নেশার মত। ছেড়ে দিলেও তা একেবারে ছেড়ে যায় না। তাই এতদিন বাদে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য হলাম, এ কথা আগে মনে পড়ে নি কেন? বিশুদা তো ডিটেকটিভ পরিচয়ে দিবানাথের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। তাহলে হু ব্লুউ হিস কভার ? একটা নামই মাথায় এল – দিবানাথের কুকর্মের সঙ্গী, পতিতালয়ের পিম্প, মানদা। সে-ই বিশুদার পরিচয় জানিয়ে দিবানাথকে সাবধান করে দেয়। বিশুদার মাথায়ও নিশ্চয়ই একথাটা এসেছিল। তাই তিনি অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিবানাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি।

কিন্তু দিবানাথ বিশুদার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল কেন ? এর সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন থাকতে পারবে না। তাই কোণঠেসা হওয়া জন্তুর মত বিশুদার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই সাব্যস্ত করেছিল। তার ফলে বিশুদাকে চিরকালের মত পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়। আর আমি হয়ে গেলাম কানা।

রাহুল রায় – পেশায় একজন অধ্যাপক ও ক্যান্সার-বিজ্ঞানী, কিন্তু নেশায় সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, বেহালা-বাদক ও আর্টিস্ট। নিয়মিত ছবি আঁকেন। ছবি প্রদর্শনী ও বিক্রী করেন, ও নিয়মিত আঁকা শেখান। এ ছাড়া আছে তিনটি রবীন্দ্রসংগীতের সি-ডি। শতাধিক বৈজ্ঞানিক 'পেপার' ছাড়াও রাহুলের ছোট গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে দেশ, কৃত্তিবাস, নব কল্লোল, প্রতিদিন, পরবাস ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়। তাছাড়া প্রকাশিত হয়েছে তিনটি ছোট গল্পের সঙ্কলন (ফলেন কমরেড, প্রতিভাস, ২০১০; নেমসেক ও অন্যান্য গল্প, প্রথম আলো, ২০১৪; চারকোলের মাও, নাটক প্রকাশন, ২০১৭; একটি কাব্য-গ্রন্থ, কবিতারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে, স্বপ্না রায়ের সঙ্গে, কৃত্তিবাস, ২০১২, একটি জীবনের ধারাপাত – সাগর পারের স্বরলিপি, ২০২৩, লিরিকাল বুকস), ও একটি উপন্যাস (আত্মপ্রকাশ, উকিয়তো, ২০২৪)। বাংলা ছাড়াও রাহুল ইংরেজীতেও নিয়মিত লেখেন। রাহুল গায়ত্রী গামার্শ পুরস্কার, নিউ জার্সি, পেয়েছেন ২০২১ সালে ইংরেজীতে ও ২০১৫ সালে বাংলায় সৃজন-মূলক সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

মিমো ফার্স্ট হবেনা

"এই জানো, মিমো কদিন ধরে একটা কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে"।

কল্লোল সবে অফিস থেকে ফেরা শরীরটাকে সোফায় ছেড়ে দিতে-দিতে একটু অবাক হয়। মিমো তো যাকে বলে ভীষণ বাধ্য আর ভালো টাইপের ছেলে। সুতপার পুরো কন্ট্রোল আছে আট বছরের পুঁচকেটার ওপর। সত্যি বলতে, ছেলেকে নিয়ে আদিখ্যেতা ছাড়া আর কোনও তেমন দায়ই নেই কল্লোলের।

– "কি করল আবার?"

সুতপা পাশে এসে বসে, "আরে, কদিন হল লিফটম্যান, সিকিউরিটি, ওর স্কুল বাসের ড্রাইভার অচিন্ত্য – সবাইকে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছে ওরা সবাই স্কুলে অঙ্কে কত নম্বর পেত। এমন কি আজ নাকি পুষ্পকেও জিজ্ঞাসা করেছে ওর স্টাডিরুম মোছবার সময় !"

কল্লোল মজা পেতে গিয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, "তাই নাকি ? আশ্চর্য্য তো ! কিন্তু কেন ? ওর নিজের কোনও প্রবলেম হচ্ছে বুঝি ম্যাথস নিয়ে ?"

– "মোটেই না", সুতপা ঘাড় নাড়ে, "লাস্ট ইউনিট টেস্টেও তো থার্টি আউট অব থার্টি। ও তো ম্যাথস পছন্দই করে। একবার কথা বলবো নাকি বলতো ওর সঙ্গে ?"

"আরে না না, ওর বয়সটা দেখো। মাথায় কি ঢুকেছে, ছেলেমানুষি করছে"। কল্লোল জরুরী কথায় আসে, "আজ ওখান থেকে মা-র রিপোর্ট কিছু পেলে ?"

– "হ্যাঁ, বলল ভালো আছে। মানিয়ে নিয়েছে অনেকটা"।

মেজাজটা কদিন ধরেই তিতকুটে হয়ে আছে, আজ যেন একেবারে খিঁচড়ে যাওয়া যাকে বলে, তাই হল। ধৈর্য্যের ফুটো-ফাটাগুলোতে দ্রুত হাতে তাপ্পি মারাটা দরকার খুব, বুঝল সুতপা।

কদিন ধরে যেন একটা আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে সে আর কল্লোল। আত্মীয়, প্রতিবেশী, অতি চেনা, সামান্য চেনা – সবার ভাবটা এমন যেন সুতপারা-ই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম করল কাজটা। এর আগে কখনও কোথাও কেউ মা বা শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়নি। অদ্ভুত এদের মানসিকতা !

কল্লোল সকাল নটায় বেরিয়ে বাড়ি ঢোকে রাত দশটায়। সে নিজে সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি বাইরে, স্কুলের চাকরির জন্য। ছেলেটা সকালে বেরিয়ে বাড়ি ঢোকে সাড়ে তিনটেয়। তাহলে মামনির সারাদিনের দায়িত্বে রইল কে ? পঞ্চাশ বছরের ছায়াদি। তার পক্ষে সম্ভব দিনের পর দিন একটা বুড়িকে সামলানো ? আর সামলাবেই বা কেন ? তার চাকরিটা তো মিমোকে দেখবার। কাজেই সে মানুষটাও তো গজগজ করে, না কি ?

একটাই বাঁচোয়া কল্লোল বুঝেছে সমস্যাটা। অবশ্য ও বুঝতই কারণ ওর কাছে ওর কেরিয়ারটা সবার আগে, তারপর বাকি সব, এমনকি ছেলেও। মিমোর জন্য কতটাই বা সময় দেয় ও ?

মিমোর কথা মাথায় আসতেই মেজাজটা সপ্তমে চড়ে গেল। কি যে ভূত ঢুকেছে ছেলেটার মাথায় ! আজ পাশের বাড়ির বিকাশকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছে যে বিকাশ অঙ্কে কত পেত। সমবায় ব্যাঙ্কের ক্লার্ক বিকাশ বেশ সন্দেহের

চোখেই দেখেছে ব্যাপারটাকে। ভেবেছে বোধহয় তার পড়াশুনার দৌড় নিয়ে আলোচনা করেছে সুতপারা। মিষ্টি হেসে ধারনাটা পরিষ্কারই করেছে সে। আজ মিমো ফিরুক, ওকে চেপে ধরতে হবে। কল্লোলের কথা শুনে অত নজর আন্দাজ করলে চলবে না ব্যাপারটা। বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এবার।

মোবাইল বাজছে। মনীষা। ওর ছেলে, দেবার্ঘ্য মিমোর সঙ্গে এক সেকশানেই পড়ে। মনীষার ছেলেটা মিমোর মতোই পড়াশুনায় বেশ ভালো, বিশেষ করে ম্যাথসে। এই নিয়ে সুতপার একটা চাপা কমপিটিশন আছে বটে মনীষার সঙ্গে, তবে সেটা চাপাই। ওপরে-ওপরে একেবারে তুই-তোকারি।

– "অ্যাই সু, তোকে কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতেই হবে", মনীষা শুরুটা এইভাবে করল।

– "কি রে?" সুতপার গলায় অজান্তেই নেমে আসে সতর্কতা।

– "তুই মিমো সোনাকে একদম বকাবকি করবিনা! ও তো একটা বাচ্চা, বল!"

সড়াৎ করে রহস্যের পর্দা সরে গেল সুতপার সামনে। ওহ! এই ব্যাপার! ন্যাকামো। আজ ম্যাথস ইউ.টি.-র খাতা বেরনোর কথা ছিল। মনীষাদের ফ্ল্যাটটা স্কুলের একদম উলটোদিকে বলে ও সুতপার তুলনায় চিরকাল একটা পজিসনাল অ্যাডভান্টেজ পায়। ছেলের কাছে আগে-ভাগে নম্বর জেনে নিতে পারে। নির্ঘাত মিমো এক-দু নম্বর কম পেয়েছে দেবার্ঘ্যর চেয়ে তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে ফোন করা হচ্ছে। সুতপা চুপ করে রইল। নেকিটা কি বলে শোনা যাক।

– "মিমোর মার্কসটা এবার খুব পুওর এসেছে তো", মনীষা চালাতে থাকে, "রিনা ম্যাম যেই জানতে চেয়েছেন যে তোমার এমন মার্কস কেন এল, অমনি মিমো সোনা বলেছে আমি তো ইচ্ছা করেই করেছি। কম নম্বর বেশী ভালো। ম্যাথসে বেশি পাওয়া ভালো নয়"।

– "কি"? সুতপার বিস্ময়টা ছিটকে বেরোল," কত পেয়েছে ও"?

– "টুয়েলভ"।

সুতপা আর কথা বলেনা। কলটা কেটে দেয়। মিমো আউট অব থার্টি টুয়েলভ পেয়েছে? ম্যাথস-এ? তাও আবার ইচ্ছা করে! ইচ্ছা করে মানেটা কি? মোবাইলটা আবার বাজছে। শাশুড়ির বৃদ্ধাশ্রম। ওনার বিকেলের ঔষধটা রোজ দিতে হবে কিনা জানতে চায়। সুতপা দুকথা শুনিয়ে দিল। ওদের হাতে যখন দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে, তারপর বারবার বিরক্ত করবার মানে হয় কি? সুতপা যে নিজের জ্বালায় মরছে তার ইয়ত্তা নেই, তার উপর আবার.....।

সুতপা কল্লোলকে একটা ফোন করল।

– "তুমি এখন ওকে কিছু বলনা। আমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরব আজ। দেন উই উইল মিট টুগেদার উইথ মিমো", কল্লোল নিদান দিল।

– "ম্যাথসে এইরকম হল কেন মিমো?" সুতপার শুরুটা বেশ ঝাঁঝিয়ে হল।

ছেলে চুপ।

কল্লোল বউকে চোখের ইশারা করল। পরিস্থিতিটা সে হ্যান্ডেল করতে চায়।

– "ক্লাসের গুড স্টুডেন্ট আহ্নিক রায়ের এমন হল কেন সোনা?" কল্লোল নরম পথে হাঁটতে চাইল।

ছেলে চুপ।

– " তুমি অতগুলো অঙ্ক করোনি কেন মিমোবাবু ? ওগুলো শেখোনি ?"

কোনো উত্তর নেই ।

– " মা যে বলল সব তোমার জানা ছিল, তবে করোনি কেন ?"

উত্তর নেই ।

– " কি হল বলো, করোনি কেন ?" কল্লোল বোঝে তার স্বরও চড়ছে ।

– " আমি অঙ্ক করবনা", এতক্ষণে জবাব এল, বেশ স্পষ্টভাবেই ।

– " করবিনা ? করবিনা মানে ?" সুতপার বিস্ময়ে রাগ মিশতে থাকে ।

– " আমি ম্যাথসে ভালো মার্কস আর নেবনা, ভালো একজাম দেবনা" ।

– " কেন ?" সুতপা চেঁচিয়ে ওঠে ।

– " ম্যাথসে ভালো হলে মা চলে যাবে" ।

– " মানে ?"

– "ঠাম্মা বলেছে বাবা ম্যাথসে খুব স্ট্রং ছিল । হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পেত," মিমো চোখ তুলে তাকাছে এখন, বিকাশ আঙ্কেল সিক্সটি পেত ম্যাথসে, অচিন্ত্যদা থার্টি, লিফটকাকু জিরো-ও পেয়েছে" ।

– "তাতে কি হয়েছে, অ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে ?" সুতপার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল । ছেলেকে এখন দুহাতে ঝাঁকাচ্ছে সে ।

মিমোর গলায় ঢেউ, "বিকাশ আঙ্কেল, অচিন্ত্যদা, লিফটকাকু সবার মা ওদের কাছে থাকে । কারও মা ওল্ড এজ হোমে থাকেনা । খালি বাবার থাকে । বাবা ম্যাথসে ভালো ছিল, তাই বাবা বড় চাকরী করে । বড় চাকরি করলে তাকে বিজি বলে । আর বিজিরা মা-দের ওল্ড এজ হোমে রেখে আসে । আমি ম্যাথসে আর কোনদিন ভালো মার্কস আনবনা । আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবনা । একটুও না", মিমো এবার ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল ।

কাঁদতে থাকা পুঁচকেটার দিকে তাকিয়ে কল্লোল থ হয়ে রইল । ছেলের দিকে এগোনোর শক্তিও যেন হারিয়েছে সে । মাথার মধ্যে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করেছে কয়েকটা প্রশ্ন । অঙ্কে সত্যিই কি ভালো ছিল সে ? খুব ভালো ? তাই যদি হবে, তবে জীবনের অঙ্কে এতবড় গরমিল হয়ে গেল কিভাবে ? কেন-ই বা ?

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট । নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন । তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি । তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে । এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য ।

সুজয় দত্ত

ভুল

চোঙা করে পাকানো খবরের কাগজটা বারান্দার চাতালের বদলে গিয়ে পড়ল সামনের একচিলতে বাগানের নরম কাদায়। ছুঁড়তে গিয়ে লক্ষ্যে ভুল হয়েছে কাগজঅলার। এ-বাড়ীর কাজের লোকটি গেট দিয়ে ঢুকে বারন্দায় ওঠার আগে কাদামাখা কাগজটা দেখে গজগজ করতে করতে তুলে নিয়ে গেল ভেতরে। এমনিতেই আসতে দেরী হয়েছে তার। রোজ ভোরবেলা উঠে লোকাল ট্রেনের ঠাসাঠাসি ভীড়ে এতটা পথ আসে। আজ তাড়াহুড়োয় সোনারপুর লাইনের বদলে ভুল করে বজবজ লাইনের গাড়ীতে উঠে পড়েছিল। আবার একটা অচেনা স্টেশনে নেমে উল্টোদিকে ফিরতে হল, তাই এত দেরী।

বাড়ীর বুড়োকত্তা অবশ্য দেরীতে আসা বা নোংরা কাগজ – কোনোটা নিয়েই কিছু বললেন না। শুধু বারান্দায় এতো ঘেউঘেউ করে কুকুর ডাকছে কেন, জিজ্ঞেস করলেন বিরক্তমুখে। আসলে কাজের লোকটি ঢোকার সময় বাগানের গেটটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে, তাই ফাঁক পেয়ে ভেতরে সেঁধিয়েছে হতচ্ছাড়ারা। অগত্যা তাকেই গিয়ে আবার তাড়িয়ে আসতে হল। গেট-টেট বন্ধ করে ঘরে ঢুকেই নজরে পড়ে তার – কত্তার বিছানার পাশের টেবিলে জলভর্তি গ্লাসটা যেমনকার তেমন রয়েছে প্লেট ঢাকা দেওয়া। তার মানে নিশ্চয়ই কাল রাতে শোবার আগে ওষুধগুলো খেতে ভুলেছেন। শরীরে রোগের ত্রিবেণীসঙ্গম তাঁর – হার্টের ব্যামো, গাঁটের ব্যামো আর পেটের ব্যামোতে মাঝেমাঝেই শয্যাশায়ী থাকেন। হার্টের রুগী এই কয়েক বছর যাবৎ, কিন্তু পেটের গন্ডগোল আর গাঁটের ব্যথা বহুযুগের পুরোনো। প্রথম প্রথম গোঁ ছিল হোমিওপ্যাথি-কবিরাজী ছাড়া দেখবেন না। তারপর তাদের ভুল চিকিৎসায় অবস্থা খারাপের দিকে গড়াচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের গাদা গাদা বড়ি গেলা শুরু করলেন যখন, ততদিনে বেশ একটু দেরীই হয়ে গেছে। এখন উঠতে ওষুধ, বসতে ওষুধ, শুতে ওষুধ।

কিন্তু ওগুলো ঠিকসময়ে খাওয়ার কথা মনে থাকলে তো ! কাজের লোক দুবেলা কাজ করে দিয়ে যাওয়া ছাড়া বাড়ীতে লোক বলতে আসে এক রাঁধুনী। বাজার-টাজারও সেই করে। তার বয়ে গেছে মনিবের শরীরস্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। এসে তাড়াহুড়ো করে বাজার নামিয়ে কোনোরকমে রান্নাটুকু সারলেই তার কম্মো শেষ। আর কাজের যা ছিরি সে তো কহতব্য নয়। চাল আনতে গিয়ে ভুল করে ডাল নিয়ে আসছে, ময়দার শিশিতে ব্যাসন ঢেলে ফেলছে, মাছ কিনতে গিয়ে আঁশ ছাড়িয়ে আনার কথা বেমালুম মাথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুড়োকত্তা এমনিতে খুব একটা কিছু বলেননা এসবের জন্য। কিন্তু গত রোববার সে টমেটোর অম্বলে চিনির বদলে ভুলে নুন ঢেলে ফেলায় খেতে বসে যখন মনিব থু-থু করে ফেলে দিলেন, তখন স্বীকার করা বা লজ্জা পাওয়া তো দূরস্থান, উল্টে তাঁকে "বুড়োবয়সে মুখে অরুচি হয়, সবকিছু ওরকম নোনতা লাগে" বলে হাত-পা নেড়ে জ্ঞান দিতে এলে উনি এক ধমক দিয়েছিলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে গোঁসা, পরদিন থেকে কামাই। আবার কদিন বাদে কাজের লোকটাকে পাঠিয়ে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করে ফিরিয়ে আনতে হল তাকে।

অতএব আজ যখন সে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ঢুকে সশব্দে বাজারের থলিটা ফেলেই বলল "এই যাঃ, পাঁচফোড়ন আনতে ভুলে গেছি। যাকগে, আজকের দিনটা জিরে-ধনে-হলুদ দিয়ে চালিয়ে নেব'খন", কত্তা মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। শুধু কাজের লোকটাকে চুপিচুপি বলে রাখলেন ও রান্না করার সময় একটু নজর রাখতে, যাতে কিছুতেই বেশী নুন না দিয়ে ফেলে। হাজার হলেও হার্টের রুগী তো – ডাক্তারের কড়া নিষেধ। নজর সে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু রাখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যে কান্ডটা করল তাতে ভালর চেয়ে মন্দ হল বেশী। ভুল করে কাপড়জামা-ডোবানো বালতিতে কাপড়কাচা সাবানের বদলে বাসনমাজা সোডা দিয়ে ফেলল। কত্তার ফতুয়া, বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাদরের রং জ্বলে গিয়ে একাকার কান্ড।

যাইহোক, সারা সকাল এইসব গন্ডগোল চলতে থাকায় কত্তা অন্যদিন একটু বেলার দিকে যে এককাপ গরম দুধ খান, সেটাই আজ খাওয়া হল না। ফুটন্ত গরম দুধ খেতে পারেন না বলে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার জন্য অল্পক্ষণ ফ্রীজে রাখা তাঁর স্বভাব। আজ উত্তেজিত হয়ে ভুল করে ডীপফ্রীজারে রেখে ফেলায় অনেকক্ষণ বাদে যখন খেয়াল হল, দেখলেন সে-দুধ আইসক্রীম হয়ে গেছে। তারপর দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে যে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শোবেন, তার জো আছে? আরেক নতুন বিপত্তি। আজ মাসের শেষ, কাজের লোকটা যাবার সময় মুখ কাঁচুমাঁচু করে মাইনে চাইছিল। তাকে তখন দাবড়ানি দিয়ে "আঃ, যা তো এখন, বিকেলে নিবি" বললেন বটে, কিন্তু টাকা যে থাকে স্টিলের আলমারীর মধ্যে। তার চাবি কোথায়? বিছানার তোষকের তলায় থাকার কথা, কিন্তু নেই তো! ভুলে কোথায় রেখেছেন কিছুতেই মনে পড়ছে না। অতএব খোঁজ খোঁজ। শেষে আলনায় ঝোলানো ফতুয়ার পকেট থেকে বেরোলো সেটা।

অবেলায় দিবানিদ্রা আচমকা ভেঙে গেল কাজের লোকের কড়া নাড়ার শব্দে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেই খেয়াল হল তাঁর পাশের ঘরে অকারণে সিলিং ফ্যানটা বনবন করে ঘুরছে – দুপুরে ঘর মোছা হয়েছিল যখন, মেঝেতে জল-জল ছিল বলে ফ্যান চালিয়ে শুকোতে দিয়েছিলেন, ঘুমোতে যাওয়ার আগে বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। শুধু শুধু কারেন্ট পুড়ল এতক্ষণ ধরে। কাজের লোক কাজটাজ শেষ করে মাইনে নিয়ে সবে গেটের বাইরে পা বাড়িয়েছে, ঠাকুরঘরে তালমিছরির শিশিটা আনতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল কত্তার – ধুপকাঠি ফুরিয়েছে, দেশলাইটাও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে অকেজো, হাজার ঘষেও জ্বালাতে পারেননি কাল। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরকে ধুপ দিতে পারবেন না এখুনি আনিয়ে না রাখলে। সকালে রাঁধুনিটা বাজার যাওয়ার সময় বলতে ভুলে গেছেন ওকে। অতএব আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাগানের গেটের কাছে গিয়ে "অ্যাই গোবিন্দ, অ্যাই গোবিন্দ" বলে চীৎকার করতে গিয়ে দেখলেন গোবিন্দ ততক্ষণে বড়রাস্তার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে, তার কানে আর পৌঁছবে না।

সেই সন্ধ্যেয় কত্তার শরীরটা কেমন যেন আনচান আনচান করে উঠল। বুকের বাঁদিকটা টান ধরেছে, অদ্ভুত একটা ব্যথা কাঁধ থেকে হাতে নেমে আসছে ক্রমশঃ, সারা দেহে কিরকম একটা অস্বস্তি। কই, অন্যদিন তো এমন হয়না – দিব্যি টিভি খুলে সিরিয়ালের পর সিরিয়াল দেখেন। কী হল কে জানে আজ ! আসলে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন যে মাসে মাসে ডাক্তার চেকআপ-এর সময় ঠিক এই লক্ষণগুলোর কথাই বারবার আউড়ে তাঁকে সাবধান করেন ডাক্তারবাবু। বলেন এগুলো হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে লোক ডাকতে, দেরী করলে জীবন নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু আজ যদি সেকথা মনে পড়তও কত্তার, চট করে লোক ডাকতে পারতেন না। কারণ পাড়ার পরিচিত করিৎকর্মা ছেলেছোকরাদের – এই যেমন হাবুল, সমীর, বাপী, শিবু, রতন – মোবাইল নম্বরগুলো একসঙ্গে লেখা ছিল যে পুরনো ডায়রীটায়, সেটা কোথায় রাখা আছে তাই তো ভুলে মেরে দিয়েছেন। ফলে রাত বাড়তে লাগল আর তার সঙ্গে একলা বাড়ীতে তাঁর অসহায় ছটফটানিও।

পরদিন সকালে কান্নার রোল উঠল সেই পাড়ায়। প্রতিবেশীরা সব গম্ভীর মুখে জটলা করে দাঁড়িয়ে গেটের সামনে। কেউ খাট-ফুল-মালার ব্যবস্থা করছে, কেউ শববাহী গাড়ীকে খবর দিচ্ছে, কেউ আবার কিছুই না করে শুধু মাতব্বরী দেখাচ্ছে। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে বেরিয়ে গেলেন একসময়। না না, আমাদের সেই কত্তার নয়। অন্য একজনের। ঠিক উল্টোদিকের দোতলা বাড়ীর সধবা বুড়িটার। বয়স সত্তর ছোঁয়নি, কোনো অসুখেও ভুগছিল না, হঠাৎ কী করে মারা গেল কে জানে। আসলে হয়েছে কী, যমরাজ গতরাতে কত্তাকেই নিতে এসেছিলেন। কিন্তু একটুর জন্য ঠিকানা ভুল করে উল্টোদিকের বাড়ীর সেই মহিলাকে তুলে নিয়ে চলে যান। ভুল কি কেবল মানুষই করে?

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

সুভাষ রায়

বাঁদরওলা

১৯৯০ সালে sabbatical leave নিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় ISI তে কাটিয়ে ছিলাম। ঢাকুরিয়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতাম। আর গোল পার্ক থেকে বাস ধরে বনহুগলীর স্টপ ছাড়িয়ে institute এর গেটে নামতাম। B T Road এ Institute এর পাঁচিলের লাগোয়া কয়েকটা ঝুপড়ি আছে – ত্রিপল আর টালির চালা দিয়ে কোনোক্রমে মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা। এমনিতে কখনোই নজরে পড়েনি। কলকাতার রাস্তায় এরকম তো কতোই আছে। হঠাৎ সেদিন দেখি একটি লোক তার কাঁধে একটা বাঁদর ও হাতে একটা ডুগডুগি নিয়ে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তার পিছনে তার বৌ একটা পুঁটলিতে সম্ভবত তার সারাদিনের খাবার ছাতু ও গুড় হাতে তুলে দিচ্ছে।

কি জানি কেন এই দৃশ্য দেখে নিজেকে খুব ছোটো মনে হোলো। এই রকম বাঁদরওলাকে তো কতো বার কতো জায়গায় দেখেছি। কখনও তো তাকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবি নি !

তার জন্যে তার বৌ নিজের দীন হীন আস্তানায় পথ চেয়ে বসে থাকে – কটাই বা পয়সা সারাদিনের রোজগার। তাই দিয়েই তাকে দুটি খাবারের সামগ্রী কিনে আনতে হয়। সব দিন হয় তো জোটেও না। আবার যে দিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন সেদিন একটু বেশী রোজগার হলে হয় তো দুটি জিলিপিও কিনে আনতে পারে বৌয়ের জন্যে। বাঁদরটাকে কতো যত্নে কতো আদরে পিতৃস্নেহ দিয়ে নিয়ে চলেছে।

প্রতিটি মানুষকে ঘিরে এক একটা সংসার রয়েছে। প্রত্যেকেই আমারই মত আশা নিরাশা দুঃখ ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে আছে। আমরা কেউ আকবর বাদশা, কেউ হরিপদ কেরাণী। কিন্তু সবাই একই রকম কান্না হাসির মানুষ।

সেই বাঁদরওলা ও তার বৌ নিজের অজান্তে আমাকে মানুষকে আলাদা করে চিনতে শিখিয়েছে।

সুভাষ রায় – Storrs, Connecticut এ থাকেন। বহুকাল University of Connecticut এ শিক্ষকতা ও গবেষণা করে আপাতত নানারকম লেখালেখি নিয়ে থাকেন। এখনো নানা ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও যুক্ত আছেন। কবিতা ও অনুবাদের পাশাপাশি রম্যরচনা মূলক লেখাও লেখেন। তেমনিই, নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দুটি লেখা পাঠালাম।

জয় মুখোপাধ্যায়

বাদল সরকার, ব্যাঙ্গালোর এবং আমি

বাদল সরকারের নাম ছেলেবেলায় আমি প্রথম শুনেছিলাম আমার বাবার মুখে। তারপর একদিন সেই দেব সাহিত্য কুটীরের খাতিরে বাদল-কাকু আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন (৬নং ঝামাপুকুর লেন আমাদের গলির নাম সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালিরা সবাই জানত)। না, বাদল কাকু কিন্তু কোন নাটকের ব্যাপারে আসেননি। এসেছিলেন আমার বাবার সঙ্গে পেশাগত আলোচনা করতে।

আমার বাবা ছিলেন civil engineer আর বাদল সরকারের ছিল একই পেশা। বাবার থেকে বয়সে অনেকটা ছোট ছিলেন কিন্তু একই কলেজের ছাত্র দুজনে। শিবপুরের Bengal Engineering College থেকে বাদাল সরকার BE পাস করেন ১৯৪৩ সালে। বাদল কাকু চলে যাবার পরে বাবা বলেছিল "এই ভদ্রলোকের নাটকের শখ, নিজে নাটক লেখেন আর অভিনয় করেন"। আমার বাবার নাটকের কোন শখ ছিলনা, তাই নাটকের নামগুলো বলতে পারেনি। বাদল-কাকুর আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল, কিন্তু আমি তখন ছোটো, কাকুর সঙ্গে নাটক নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

অনেক বছর পরে, সেই বাদল-কাকু আমার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে বললেন "তুমি শচিন-দার ছেলে? আমাকে আগে দেখেছ? তোমার মনে আছে?" আমি তখন বসে আছি বাদল-দা মানে বাদল কাকুর মুখোমুখী, রাত প্রায় ১-৩০টা।

এ হল ১৯৭৬ সালের ঘটনা। কর্নাটকের বিখ্যাত নাটকের দল "সমুদয়" বাদল সরকারকে বাঙ্গালোরে নিয়ে আসে Acting Workshop করাতে। সেই workshop চলেছিল ১০ দিন ধরে আর অংশগ্রহণকারীরা ছিল কর্নাটকের বিভিন্ন প্রান্তের কান্নাড়া নাটকের কুশীলবগণ। সবারই কাছে বাদল সরকার তখন বাদল-দা। শেষ দিন ছিল এক বিশেষ উৎসব। ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলাম। Workshop এর ঘটনাস্থল ছিল Kumbhalgodu, Mysore Road. বড় Centre, শহর থেকে দূরে, নিরিবিলি জায়গা, ১০ দিনের residential programme, সবাই সেখানে YMCA র একটা নাটকের জগতে মগ্ন। সারা সন্ধ্যে ধরে অনুষ্ঠান, অংশগ্রহণকারীরা Workshop-এ যা শিখেছে তা পরিবেশন করল কান্নাড়া ভাষায়। আমার মতো আরো কিছু নাটক-পাগল অতিথি সবাই মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখলাম সেই অভিনয়। অনুষ্ঠান শেষ হল, খাওয়া শেষ করে মাঠের মধ্যে বড় করে আগুন জেলে আরম্ভ হল Campfire. আগুনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান আর নাচ চলল অনেক রাত অবধি। সব শেষ হলে ঘুমোতে যাবার পালা। বড় ঘরে লাইন দিয়ে বিছানা করে শোবার আয়োজন। বাদল দার জন্যে একটা আলাদা ঘর। আমার শোবার ব্যবস্থা সেই ঘরে।

আমি এখানে আসি ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে। সে বছরই "জয়মহল" দুর্গাপূজায় অভিনয় করেছিলাম, হাসির নাটক "বড় পিসিমা "।

১৯৭৭ সালে "ইন্দিরানগর"এর নাটকের দল "কোরাস" বাদল সরকারকে আনে। ওনার দল "শতাব্দী" পরিবেশন করে তিনটি নাটক, "ভোমা", "মিছিল" আর "হট্টমালার ওপারে"। সেই প্রথম আমরা দেখলাম নতুন আঙ্গিকের নাটক। যাত্রার মতো মাঝখানে অভিনয় আর দর্শকরা সব ঘিরে বসে। যাত্রার সঙ্গে কিন্তু বিস্তর ফারাক। মঞ্চসজ্জা নেই, আবহ সঙ্গীত নেই, আলোর কারিকুরি নেই, এমনকি নেই বিশেষ সাজবেশ বা প্রসাধন! নাটকের পরিবেশন শুধুমাত্র অভিনয় আর দেহভঙ্গির ওপর। এটাই বাদল সরকারের অবদান, তাঁর ভাষায় "থার্ড থিয়েটার"।

১৯৭৭ সালে “বালভবন” মঞ্চে হয় “Spartacus”, পরিবেশনা করেন I.I.Sc.র ছাত্রবৃন্দ, পরিচালক অমিতাভ সরকার এবং অম্বর মিত্র।

১৯৭৮ সালে “বালভবন” মঞ্চে হয় “বাকি ইতিহাস”, পরিবেশনা করেন “মারীচ”, পরিচালক রঞ্জন ঘোষাল।

১৯৭৯ সালে “বাকি ইতিহাস” নাটকের ইংরাজি অনুবাদ পরিবেশনা করেন “BLT” (Bangalore Little Theatre), পরিচালক II. M. Professor Vijay Padaki.

১৯৭৯ সালে, Max Muller Bhavan নিমন্ত্রণ করেন এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে “Herr Fritz Benevitz”, Director of Brecht Theatre of Berlin. তিনি একটি Workshop করান যেখানে আমি শিখি Third Theatre-এর অভিনয় কৌশল। আমাদের Workshop চলে ১০ দিন ধরে, ঘটনাস্থল “Karnataka Chitrakala Parishad” আর শেষদিনে আমরা পরিবেশনা করি “Caucasian Chalk Circle”। এই নাটকের বাংলা রূপান্তর “চক্র”, বাদল সরকার করেছেন।

১৯৮০ সালে আমি ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চলে যাই মুম্বাই, প্রায় ৮ বছর কাটিয়ে ফিরে এসেছি ১৯৮৭ সালের শেষে। ১৯৮৮ সালে আমি “Third Theatre” আঙ্গিকে পরিচালনা করি “Bhoma” (“ভোমা”র ইংরাজি অনুবাদ)। প্রযোজনা করে BLT; আমরা তিন জায়গায় মঞ্চস্থ করি – Bishop Cotton Boys' School, I. I.M., I. I.Sc.

১৯৮৯ সালে আমি একটি Theatre Workshop করি, I. I.Sc. Dramatics Club এর আমন্ত্রণে। আমি “Third Theatre” আঙ্গিকের তালিম দিই, আর একইভাবে আমার ছাত্র-ছাত্রিরা পরিবেশনা করেন “Procession”। (“মিছিল”এর ইংরাজি অনুবাদ)

১৯৯০ সালে “Bengali Association” পরিবেশনা করে “পাগলা ঘোড়া”।

বাদল-দা বললেন, “এত রাতে আর কি ঘুমব? চল আমরা আড্ডা মেরে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিই। জয়, তোমার বাড়ী কোথায়? নাটকের শখ আছে?”

আমি ইতস্তত করে বললাম, “বাদল কাকু আপনি আমায় চিনতেন, আপনি আমাদের বাড়ী আসতেন, অনেক বছর আগে।”

বাদল-কাকু বললেন, “আমায় সবাই বাদল-দা বলে। তোমাদের বাড়ী? “কি ব্যাপার বলতো?”

“আপনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।”

“তোমার বাবা? কোন নাটকে ছিলেন? কি নাম?”

“না মানে নাটকের জন্যে নয়, আমার বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, Civil Engineer ছিলেন।”

(সেই বাদল-কাকু আমার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে বললেন “তুমি শচিন-দার ছেলে? আমাকে আগে দেখেছ? তোমার মনে আছে? শচিন-দা কেমন আছেন?”

“বাবা মারা গেছেন গতবছর।”

“ওহো, খুব ভাল লোক ছিলেন, বয়েস হয়েছিল।”

সারারাত আড্ডা চলল। বাদল সরকারের জীবনের গল্প, বিভিন্ন নাটকের কথা, এখনো যেন আমার কানে লেগে আছে।

বাদল-দার আসল নাম ছিল সুধীন্দ্রানাথ সরকার। জন্ম ১৫ই জুলাই ১৯২৫ সালে কোলকাতায়। ওনার বাবা ছিলেন Scottish Church College-এ ইতিহাস-এর অধ্যাপক। উনিও Scottish Church School/College থেকে পাস করেন। পরে ভর্তি হন, আগেই বলেছি Shibpur BE College, সেখান থেকে পাস করে Civil Engineer/Town Planner এর চাকরী করেন বহু বছর। বিদেশে ছিলেন বেশ কিছু বছর – ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর নাইজিরিয়া।

ছোটবেলা থেকেই নাটকের উৎসাহ ছিল। প্রথম অভিনয় করেন স্বরচিত "বড় তৃষ্ণা" নাটকে ১৯৫১ সালে। নাটকের দলটি ছিল "চক্র"।

প্রবাসকালীন লেখেন বিখ্যাত সব নাটক, ("বাকী ইতিহাস", "এবং ইন্দ্রজিত", "ত্রিংশ শতাব্দী", "প্রলাপ", "শেষ নেই", "পাগলা ঘোড়া" ইত্যাদি)। এই নাটকগুলি বেশীর ভাগ পরিবেশনা করেন শম্ভু মিত্রর "বহুরূপী" দল। নিজের নাটকদল "শতাব্দী" চালু করেন ১৯৭৬ সালে। মোট নাটক লিখেছেন ৫০এর অধিক। এখানে সব নাটকের কথা বলছিনা। কিন্তু ভেবে দেখলে ওনার অনেক নাটক আমি ব্যাঙ্গালোরে দেখেছি, তার কথাই বলি।

অনেক বছর পরে ২০১৪ সালে দেখলাম হাসির নাটক "সলুশন এক্স", পরিবেশনায় "ঐকতান", পরিচালক ভাস্কর চক্রবর্তী।

এর মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে, বাদল সরকারের আরও অনেক নাটক হয়েছে অনেকবার বাংলা, ইংরাজি, কান্নাড়া ও অন্য ভাষায়। আমি সেসবে যুক্ত ছিলামনা বলে তার আলোচনা করছিনা। বাদল সরকার জীবনে অনেক সম্মান অর্জন করেছেন।

১৯৬৮ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার।

১৯৭২ সালে পদ্মশ্রী।

১৯৭৯ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমী – রত্ন সদস্য।

কিন্তু তিনি ছিলেন মাটির মানুষ। তাই কোন খ্যাতি তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি। ২০১০ সালে ভারত সরকার যখন তাঁকে পদ্মভূষণ দেয়, তিনি প্রত্যাখ্যাত করেন, বলেন তাঁর কাছে সঙ্গীত নাটক একাডেমী – রত্ন সদস্য সম্মান সবচেয়ে মূল্যবান।

বাদল সরকার শেষ নাটক পরিচালনা করেন ২০০৩ সালে। এক পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে এর পরে ওনার পক্ষে পরিচালনা করা আর সম্ভব হয়নি। লেখনী ছাড়েননি তবু। লিখেছেন অনেক, অনুবাদ করেছেন বা বিদেশী লেখার ছায়া অবলম্বনে লিখেছেন।

এই অদ্ভুত কর্মজীবন শেষ হয়েছে ১৩ই মে, ২০১৩ সালে। ওনার লেখা নাটক পড়ে, দেখে এবং অভিনয় করে আমি আমার বাকী জীবন কাটিয়ে দেব। আক্ষেপ রয়ে গেল আমি অমল, বিমল বা কমল হয়ে রইলাম, ইন্দ্রজিৎ হতে পারলাম না।

শুভ্র দাস

ভাস্কো দা গামার দেশে

ভারতীয় ইতিহাস পড়তে গেলে পর্তুগিজদের কথা না জেনে উপায় নেই। এই তো সেদিনও গোয়া, দমন ও দিউ পর্তুগিজ শাসনের অধীনেই ছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা পর্তুগাল থেকে তাঁর জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকটে এসে পৌঁছেছিলেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে যান, এবং আরও কয়েকবার ভারতে আসেন। শেষ পর্যন্ত ১৫২৪ সালে ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথমে তাঁকে কোচিতে সমাহিত করা হলেও পরে তাঁর দেহাবশেষ লিসবনের বেলেমে অবস্থিত জেরোনিমোস মনাস্ট্রিতে (Jerónimos Monastery) স্থানান্তর করা হয়, যেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধি।

সম্প্রতি আমরা সেই পর্তুগালেই বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা মানে আমার স্ত্রী মিতালি, আমি, আমার মেয়ে মধুরিমা, জামাই রিচার্ড ও তাদের এক কলেজ সহপাঠী বন্ধু ক্রেইগ। যাত্রা শুরু করার সময় ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের সেই কয়েক শতাব্দীর পুরোনো সম্পর্কগুলোর কথাই মনে পড়ছিল। বস্টন থেকে বিমানে সরাসরি লিসবন। সেখানে নেমেই প্রথম যা অনুভব করলাম তা হলো ওই জায়গাটার সাথে ভারতবর্ষের আশ্চর্য রকমের মিল। গরম আর আর্দ্রতা ছিল ভারতীয় গ্রীষ্মের মতোই, আর উবার ধরার জন্য বিমানবন্দরের ভূগর্ভস্থ পার্কিং এলাকায় অপেক্ষা করা মানুষের ভিড়, বার বার উবের ক্যান্সল্যাশন অথচ অবিচলিত অপেক্ষারত মানুষ, আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো মুম্বাই বিমানবন্দরের কথা।

বিমানবন্দর থেকে আমাদের চালক পৌঁছে দিলেন আমাদের এয়ারবিএনবির দরজায়। বাড়িটি পাঁচতলা, প্রাচীন। নিচতলা থেকে ওপরের তলায় ওঠার জন্য চওড়া ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। একেবারে ওপরতলার ছাদের স্কাইলাইট থেকে রোদের আলোয় উজ্জ্বল সেই সিঁড়ি। উঁচু ছাদ আর বিশাল লম্বা দরজাগুলো দেখে কলকাতার নানা প্রান্তে এখনও দাঁড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ আমলের বাড়িগুলোর কথা মনে পড়ে।

লিসবন শহরটি সাতটি পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে। শহরের কেন্দ্রস্থল, বা **বাইশা (Baixa)**, একটি উপত্যকায় অবস্থিত। তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে **রুয়া অগুস্তা (Rua Augusta)** – পথচারীদের জন্য তৈরি সুদীর্ঘ একটি রাস্তা, যার দু'পাশে সারি সারি রেস্তোঁরা আর রাস্তার মাঝখানে বাইরে বসে খাওয়ার টেবিল। এই রাস্তা একটি বিশাল তোরণ পেরিয়ে গিয়ে মিশেছে **তাগুস (Tagus)** নদীর ধারে বিস্তীর্ণ **প্রাসা দো কোমের্সিও (Praça do Comércio)** চত্বরে। সেই চত্বরের মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে পর্তুগালের **রাজা প্রথম জোসে (King José I)**-এর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা লিসবনে পৌঁছেছিলাম ফুটবল বিশ্বকাপের মরসুমের একেবারে শুরুতে। প্রতি সন্ধ্যায় চত্বরটা যেন নতুন করে উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠত। বিশাল পর্দায় সরাসরি বিশ্বকাপের খেলা দেখানো হতো, চারপাশে বিয়ারের স্টল বসত, আর বিভিন্ন দেশের জার্সি পরা মানুষের ভিড়ে পুরো জায়গাটা এক আনন্দময়, উৎসবমুখর পিকনিকের আবহ তৈরি করত।

লিসবনে আমাদের পৌঁছনোর দিনটা ছিল ১২ই জুন। তখন অবশ্য আমরা জানতাম না যে দিনটি শহরের অন্যতম উৎসবের দিন। পরে জানতে পারলাম, সেদিনই শুরু হচ্ছে বিখ্যাত **সার্ডিন উৎসব**। যদিও স্থানীয়রা আদর করে একে সার্ডিন উৎসব বলেই ডাকে, আসলে এটি **সেন্ট অ্যান্টনির উৎসব**। সেন্ট অ্যান্টনি হলেন লিসবন শহরের অধিষ্ঠাত্রী সেন্ট, আর তাঁকেই ঘিরে এই কয়েক দিনের উৎসব।

ব্যাগপত্র রেখে, অল্প কিছু খেয়ে, আমরা ঠিক করলাম, দিনের বাকি সময়টা কাটাব লিসবনের সবচেয়ে পুরোনো আর পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা এলাকা **আলফামা (Alfama)**-য়। গাইডবইয়ের নির্দেশ মেনে কিছুটা হাঁটলাম, তারপর

দু-একটি এলিভেটর ব্যবহার করে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল পাহাড়চূড়ার ওপর **সাও জর্জে দুর্গ (Castelo de São Jorge)**। ভ্রমণলেখক রিক স্টিভসের পরামর্শ ছিল – পাহাড়ে আগে উঠে যাও, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে নিচে নেমে এসো, নানা সুন্দর জায়গায় থামতে থামতে। তাতে যেমন হাঁটার কষ্ট কম হয়, তেমনি শহরটাকেও নানাভাবে উপভোগ করা যায়।

নিচে নামতে নামতে বুঝতে পারলাম, সারা এলাকা যেন উৎসবের রঙে রঙিন। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বিয়ারের স্টল। পৃথিবীর যে সব শহরে এখনো টিং টিং করে ট্রাম গাড়ি চলে লিসবন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই আলফামা এলাকায় উঁচু নীচু পাহাড়ি রাস্তায় ২৮ নম্বর আরে ১২ নম্বর ট্রাম চলে। আজ উৎসবের জন্য সেই ট্রাম গুলি চলছে না যদিও রাস্তায় ট্রাম লাইন দেখতে পাচ্ছিলাম। তার বদলে রাস্তাজুড়ে মানুষের ঢল। চারদিকে গান বাজছে, হাসির শব্দ, উৎসবের উচ্ছ্বাস। এক জায়গায় দেখি আস্ত একটা শূকর ধীরে ধীরে আগুনে রোস্ট করা হচ্ছে। সেই মাংস দিয়েই তৈরি হচ্ছে রাস্তার ধারে বিক্রি হওয়া স্যান্ডউইচ। কেউ বিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে, কেউ কয়লার আগুনে পোড়ানো সার্ডিন খাচ্ছে, আবার কেউ খাচ্ছে **বিফানা (Bifana)** – পর্তুগালের বিখ্যাত পর্ক স্যান্ডউইচ। চারদিকে যেন এক অনাবিল উৎসবের আবহ।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। পাহাড়ের গা থেকে শহরটাকে যেন নতুন করে দেখা যাচ্ছিল। লালচে-কমলা টালির ছাদের সমুদ্র, প্রাচীন গির্জার চূড়া, আর দূরে তাগুস নদী – সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় **মিরাদৌরো (Miradouro)** – অর্থাৎ শহর দেখার জন্য নির্দিষ্ট ভিউপয়েন্ট। পরে জানতে পেরেছিলাম, লিসবনে এমন অসংখ্য মিরাদৌরো রয়েছে, প্রত্যেকটির দৃষ্টিকোণ কিছুটা আলাদা, প্রত্যেকটি আবার সূর্যাস্তের আলোয় একেক রকমের সুন্দর। আমাদের বেড়ানোর পুরো সময়টায় আমরা বারবার এইসব মিরাদৌরোয় ফিরে ফিরে গিয়েছি।

বিভিন্ন মিরাদৌরো, *সূর্যাস্তের আলোয় একেক রকম সুন্দর*

কিন্তু প্রথম সন্ধ্যায় এসব কিছুই জানতাম না। শুধু অবাক হয়ে দেখছিলাম শহরের আনন্দ, মানুষের উৎসব, আর চারপাশের প্রাণচাঞ্চল্য। অনেক পরে বুঝেছিলাম, আমরা ঘটনাচক্রে লিসবনে পৌঁছেছিলাম বছরের সবচেয়ে উৎসবমুখর সময়গুলোর একটিতে।

আমরা যখন সার্ডিন উৎসবের আনন্দে মেতে আছি – রাস্তার গান শুনছি, মানুষকে খেতে-দেতে আর উৎসব করতে দেখছি – ঠিক তখনই একের পর এক ই-মেল আসতে শুরু করল।

ভূমিকম্প আর পাস্তেল দে নাতা

পরদিন আমাদের পরিকল্পনা ছিল লিসবনের কাছের ছোট্ট শহর **সিন্ত্রা (Sintra)** ঘুরতে যাওয়ার। লিসবন থেকে ট্রেনে মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ, কিন্তু ছোট্ট এই শহরটি যেন প্রাসাদের শহর। এখানে রয়েছে ন্যাশনাল প্যালেস, রঙিন পেনিয়া

লিসবন ট্রাম

প্যালেস, মুরিশ ক্যাসল – আরও বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রাসাদ। শুনে অবাক হয়েছিলাম, এত ছোট্ট একটি শহরে নাকি মোট আটটি প্রাসাদ রয়েছে। মধ্যযুগের এই স্থাপত্যগুলোই সিন্ত্রাকে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনস্থানে পরিণত করেছে।

আমরা আগেভাগেই কয়েকটি প্রাসাদ দেখার টিকিট কেটে রেখেছিলাম। কিন্তু লিসবনে পৌঁছনোর পর থেকেই একের পর এক ই-মেল আসতে শুরু করল। অস্বাভাবিক গরমের কারণে আশপাশের জঙ্গলে আগুন লেগে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই যেসব প্রাসাদে আমাদের বুকিং ছিল, সেগুলো হয়তো বন্ধ থাকবে। কোথাও রিফান্ডের প্রস্তাব, কোথাও অন্য দিনের বুকিং, কোথাও আবার অন্য প্রাসাদে যাওয়ার সুযোগ। মুশকিলে পড়ে গেলাম। পুরো দিনের পরিকল্পনাই যেন ভেস্তে যাচ্ছে। একে একে বুকিং বাতিল করা, রিফান্ডের আবেদন করা, নতুন করে দিনের পরিকল্পনা করা – সব মিলিয়ে বেশ ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলাম – চল, লিসবনের একটা **ফুড ট্যুর** করা যাক। নতুন শহরকে তার খাবারের মাধ্যমে চেনার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ আমাদের দেখা হল **ফুড ট্যুর** গাইড **রুই**-এর সঙ্গে। শহরের প্রধান চত্বরের কাছে দাঁড়িয়েই তিনি লিসবনের ইতিহাসের গল্প শুরু করলেন। আজকের লিসবনকে দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু **১৭৫৫** সালে এই শহরের ইতিহাস এক ভয়াবহ মোড় নিয়েছিল। সেই বছরের **১** নভেম্বর – **অল সেইন্টস ডে**। পর্তুগালের অধিকাংশ মানুষ তখন গির্জায় প্রার্থনায় ব্যস্ত। মোমবাতি জ্বলছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। ঠিক সেই সময় আঘাত হানে ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৯। ভূমিকম্পটি প্রায় দশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। অসংখ্য গির্জার ছাদ ভেঙে পড়ে উপাসনায় মগ্ন মানুষের ওপর। হাজার হাজার মানুষ সেখানেই প্রাণ হারান। যাঁরা কোনোমতে বেঁচে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে নদীর দিকে ছুটেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অদ্ভুত এক দৃশ্য – নদীর জল যেন সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছে। তখন হয়তো কেউ বুঝতে পারেননি, কিন্তু সেটাই ছিল সুনামির পূর্বলক্ষণ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশাল সুনামি এসে আছড়ে পড়ল। ভূমিকম্প থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রাণ হারালেন সেই জলোচ্ছ্বাসে।

এরপর আরও এক বিভীষিকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখে গেছেন, নদীর জল যেন আগুনে জ্বলছিল। কারণ, তখন গির্জাগুলোতে অসংখ্য তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। ভূমিকম্পে সেই তেল নদীর জলে মিশে যায়। কোথাও আগুনের সংস্পর্শে এসে সেই তেল জ্বলে ওঠে, আর সেই আগুন নাকি টানা আট-দশ দিন ধরে জ্বলেছিল। পর্তুগালের ইতিহাসে এটি ছিল এক বিরাট জাতীয় বিপর্যয়। লিসবন শহরে কার্ম কনভেন্ট ও চার্চ অফ সাও ডোমিঙ্গস এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেই ভূমিকম্পের নিদর্শন হিসাবে। আজকের আধুনিক লিসবন মূলত সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরই নতুন করে গড়ে উঠেছে।

এই ভূমিকম্পের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও কম ছিল না। সেই সময় চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রবল। রাজার ওপর কর্তৃত্ব ছিল এবং তার সাথে ছিল প্রচুর ধন সম্পদ ও জমি জায়গা। কিন্তু অল সেইন্টস ডে-র মতো একটি পবিত্র দিনে এমন ভয়ংকর বিপর্যয় মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে রাজাদের মধ্যেও চার্চের প্রতি আস্থা কমতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চার্চের ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই কমতে থাকে, আর রাষ্ট্র তাদের অনেক সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

চার্চ অফ সাও ডোমিঙ্গস

এই ইতিহাসের একটি অদ্ভুত এবং মধুর দিকও আছে।

চার্চের আর্থিক সচ্ছলতা কমতে শুরু করলে পুরোহিতরা নতুন আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। তখন পুরোহিতরা তাঁদের পোশাক শক্ত বা স্টার্চ করার জন্য ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করতেন। ফলে প্রচুর ডিমের কুসুম পড়ে থাকত। অন্যদিকে, পর্তুগালে তখন আখের চাষও প্রচুর হতো, ফলে চিনিরও কোনো অভাব ছিল না। এই অতিরিক্ত ডিমের কুসুম আর চিনি মিলিয়েই তৈরি হলো **পাস্তেল দে নাতা**। এটি একটি টার্ট জাতীয় মিষ্টি যার খোলটা ময়দার আর মাঝখানে ডিম-এর তৈরী মিষ্টি অংশটুকু। এটি পর্তুগালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচিত মিষ্টি। আমাদের এই ভ্রমণকালে প্রায় প্রতিদিনই বার বার করে খেয়েছি। পর্তুগালে বেড়াতে এসে এটি না খেলে ভ্রমণ অপূর্ণই থেকে যায়।

যাই হোক, আবার ফুড ট্যুরের কথায় ফিরে আসি।

আমাদের গাইড আমাদের চার-পাঁচটি আলাদা রেস্তোঁরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটি জায়গায় আমরা কিছুক্ষণ বসতাম, এক-দুটি বিশেষ পদ পরিবেশন করা হত, তার সঙ্গে থাকত সেই খাবারের উপযোগী একটি নির্দিষ্ট ওয়াইন। খাবারের স্বাদ উপভোগ করে আবার পরের গন্তব্যে রওনা দিতাম। প্রথম দিকেই খেয়েছিলাম অলিভ অয়েল দিয়ে পরিবেশন করা গ্রিলড সার্ডিন মাছ। তারপর এল একটি সি-ফুড স্ট্যু – নাম **Arroz de Marisco**। এটি কিছুটা স্প্যানিশ **পায়েয়া**-র মতো হলেও একেবারে এক নয়। এতে ভাত ও নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ-চিংড়ি থাকে, তবে এটি পায়েয়ার তুলনায় অনেক বেশি তরল। এরপর খেলাম **বিফানা**, পর্তুগালের বিখ্যাত পর্ক স্যান্ডউইচ।

সি-ফুড স্ট্যু, Bacalhau à Brás, প্যাস্টাস দে বাক্যালহাউ

তারপর এল কড মাছের পদ। পর্তুগিজ ভাষায় **Bacalhau** মানেই কড মাছ। এই মাছ পর্তুগিজদের খাদ্যসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুনলাম, কড মাছ দিয়ে নাকি হাজার হাজার রেসিপি রয়েছে। একটি খেলাম **Bacalhau à Brás**। এই পদটি আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কড মাছের সঙ্গে থাকে সরু করে কাটা, কুচকুচে ভাজা আলুর স্টিক – দেখে আমার বারবার বাংলার ঝুরি আলুভাজার কথা মনে পড়ছিল। মাছ, আলু, ডিম আর মশলা একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি এই খাবারটি প্রায় প্রতিটি পর্তুগিজ পরিবারেরই পরিচিত পদ। মজার বিষয় হলো, প্রত্যেক বাড়ির ঠাকুমা বা দিদিমার নাকি নিজস্ব আলাদা রেসিপি আছে। তাই একই খাবারের স্বাদও বাড়িভেদে একটু একটু বদলে যায়। আর একটি পদ আছে যা একেবারেই মাছের চপ এর মতো নাম প্যাস্টাস দে বাক্যালহাউ। পানীয় হিসেবে তৌরের একেবারে শেষে আমাদের দেওয়া হয়েছিল **জিঞ্জা (Ginjinha)**। এটি টক-মিষ্টি চেরি দিয়ে তৈরি এক ধরনের লিকার, ছোট শট

গ্লাসে পরিবেশন করা হয়। শেষে আমরা পৌঁছলাম একটি বিখ্যাত ডেসার্ট এর দোকানে। সেখানে আবার খেলাম গরম গরম **পাস্তেল দে নাতা**। দুটো খেয়ে তবেই ফুড ট্যুরের ইতি। খাবারের মাধ্যমে একটি দেশের সংস্কৃতিকে জানার এর চেয়ে সুন্দর উপায় আর কী হতে পারে! আমাদের কাছে এই ফুড ট্যুর ছিল পর্তুগালকে আবিষ্কারের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। পেট ভরে, মন ভরে, বিকেলের বাকি সময়টা কাটানোর জন্য আমরা শহরের কেন্দ্র থেকে একটু দূরে, নদীর ধারে **বেলেম**-এর দিকে রওনা দিলাম।

পাস্তেল দে নাতা

শহরের পশ্চিম প্রান্তে, টেগাস নদীর মোহনার কাছাকাছি অবস্থিত জায়গাটার নাম **বেলেম**। পর্তুগালের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে এখানেই। পর্তুগিজরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাবিক জাতি হিসেবে পরিচিত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যারা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এক সময় নৌসফরে এতটাই পারদর্শিতা অর্জন করেছিল যে তারা পৃথিবী সফরে বেরিয়ে পড়ে। এবং নানান কোনে গিয়ে নতুন নতুন দেশে প্রথমে বাণিজ্য তারপর ঔপনিবেশিক রাজত্ব শুরু করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো পর্তুগিজ, ডাচ, স্প্যানিশ, ও ফরাসীদের এই নৌবিহার আর অনুসন্ধিৎসা সারা পৃথিবীর ইতিহাস চিরকালের মতো বদলে দিয়েছিলো। পর্তুগিজদের জাহাজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ভারত, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং আরও বহু দেশে পৌঁছেছিল। সেই সমুদ্র অভিযানের স্মৃতি আজও বেলেমের নানা স্থাপত্যে অম্লান হয়ে আছে।

জিঞ্জা (Ginjinha)

সেখানকার সবচেয়ে পরিচিত স্থাপনাগুলোর একটি হলো **বেলেম টাওয়ার**। ষোড়শ শতকে নির্মিত এই ছোট দুর্গটি একসময় ছিল লিসবনের প্রবেশদ্বার। সমুদ্রপথে শহরে প্রবেশ করলে এটিই ছিল প্রথম চোখে পড়া স্থাপনা, আর শহর ছেড়ে যাত্রা শুরু করলে এটিই ছিল শেষ বিদায়ের দৃশ্য। এই টাওয়ারটি যেন আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই সব দুঃসাহসী নাবিকদের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে, যারা একদিন অজানা পৃথিবীর খোঁজে পাল তুলে বেরিয়ে পড়েছিল।

বেলেম টাওয়ার, মনুমেন্ট টু দ্য ডিসকভারিজ

নদীর ধারে আরেকটি অসাধারণ স্থাপনা হলো মনুমেন্ট **টু দ্য ডিসকভারিজ** (**Monument of the Discoveries**)। ক্যারাভেল জাহাজের আকৃতিতে নির্মিত এই বিশাল স্মৃতি স্তম্ভটি পর্তুগালের বিখ্যাত নাবিক, মানচিত্রবিদ, অভিযাত্রী এবং রাজাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটি বিশাল জাহাজ

নদীর তীরে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের দুই পাশে সারি সারি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ভাস্কর্য এই স্মৃতিস্তম্ভটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সেখান থেকে একটু ভেতরে গেলেই রয়েছে বিশাল **জেরোনিমোস মঠ** (**Mosteiro dos Jerónimos**) – ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত এই অপূর্ব স্থাপনাটি শুধু স্থাপত্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, এখানেই রয়েছে ভাস্কো দা গামার সমাধি। ভাস্কো দা গামার মৃত্যু হয়েছিল ভারতে। প্রথমে তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল, পরে তাঁর দেহাবশেষ লিসবনে এনে এই মঠে পুনরায় সমাহিত করা হয়। মঠটির নির্মাণ ব্যয় বহন করা হয়েছিল মূলত প্রাচ্যের মশলার ব্যবসা থেকে অর্জিত বিপুল সম্পদ দিয়ে। এক সময় পর্তুগিজরা ভারতসহ পূর্ব বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য করত, আর সেই মশলার বাণিজ্যের লাভই এই অনন্য স্থাপত্য নির্মাণের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল।

বিকেলের বাকি সময়টা আমরা এই ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখেই কাটালাম। দিনের শেষ গন্তব্য ছিল পর্তুগালের অন্যতম প্রাচীন বেকারি **Pastéis de Belém**। ১৮৩৭ সাল থেকে এখানেই তৈরি হচ্ছে বিখ্যাত **Pastel de Nata**। আগের দিন যেমন একবার খেয়েছিলাম, সেদিন তৃতীয় বারের জন্য সেই অসাধারণ কাস্টার্ড টার্ট খাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করিনি।

সন্ধ্যা নামার পর আমরা ট্রামে করে আবার শহরের কেন্দ্রে ফিরে এলাম। সেখানে তখন বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা তুঙ্গে। সেদিন ছিল ব্রাজিল এর খেলা। ব্রাজিল ছিল পর্তুগিজ কলোনি, বহু ব্রাজিলের নাগরিক লিসবনে বাস করেন। তাই ব্রাজিলের হলুদ রঙের জার্সিতে ভরে গিয়েছিলো ছত্তর। শহরের মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে বসে বড় পর্দায় খেলা দেখতে দেখতে আর ট্যাগস নদীর থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করতে করতে শেষ করলাম লিসবনের আরেকটি স্মরণীয় দিন।

বিশ্বকাপ ফুটবল

পরের দিন আমরা লিসবন থেকে রওনা দিলাম পর্তুগালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর **পোর্তো**-র উদ্দেশ্যে। তবে সরাসরি না গিয়ে পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য থামলাম আরেকটি ঐতিহাসিক শহর **কোইমব্রা**য়। লিসবন থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টার পথ কোইমব্রা, আর সেখান থেকে আরও দেড় ঘণ্টা গেলে পোর্তো।

ইউনিভার্সিটি অব কোইমব্রা।

কোইমব্রা অত্যন্ত সুন্দর একটি শহর। শহরের পুরোনো অংশটি একটি পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছে, আর সেই পাহাড়ের চূড়াতেই রয়েছে ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় – **ইউনিভার্সিটি অব কোইমব্রা**। ১২৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পর্তুগালেরই নয়, সমগ্র ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি।

বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিকাংশ বাড়ি একটি বিশাল কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণকে ঘিরে তৈরি। এখানকার রাজপ্রাসাদটি একসময় পর্তুগালের রাজার ছিল, পরে সেটিই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়। আজও সেই প্রাসাদই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর লেগেছে এখানকার বিখ্যাত লাইব্রেরিটি – **Biblioteca Joanina**। একে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর একটি বলে মনে করা হয়। এই লাইব্রেরিকে ঘিরে একটি মজার তথ্যও আছে। এখানে এখনও একদল বাদুড় বাস করে। রাতের বেলা তারা উড়ে বেরিয়ে বইয়ের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ফেলে, ফলে শত শত বছরের পুরোনো বইগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষিত থাকে।

আরও একটি অদ্ভুত বিষয় হলো, লাইব্রেরির নিচের তলায় রয়েছে কয়েকটি পুরোনো জেলখানা। অবশ্য এখন আর সেগুলো জেলখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্টু ছাত্রদের শাস্তি হিসেবে সেখানে বন্দি করে রাখা হতো। খাবার দেওয়া হতো নিয়মিত, ক্লাসের সময় তাদের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হতো, তারপর আবার সেই কক্ষে ফিরিয়ে আনা হতো। কেউ কয়েক দিন, কেউ বা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এভাবে শাস্তি ভোগ করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এটি এক অভিনব অধ্যায়।

রাজপ্রাসাদের ভেতরের অংশ যেমন অপূর্ব, তেমনি এর উপরের তলায়, পিছন দিকে রয়েছে একটি সরু বারান্দা। সেখান থেকে পুরো কোইমব্রা শহরটির অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় – লাল টালির ছাদের সারি, দূরে বয়ে চলা **মন্ডেগো (Mondego)** নদী, আর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা পুরোনো শহর। শহরের নিচ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠার পথটিও বেশ উপভোগ্য। একটি ঢালু রাস্তা ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। দু'পাশে ছোট ছোট রেস্তোঁরা, কফিশপ আর দোকান। পথেই পড়ে কোইমব্রার পুরোনো ক্যাথেড্রাল, যা দেখতে অনেকটা মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো। সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে যাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রাঙ্গণে।

মন্ডেগো (Mondego) নদী, কোইমব্রা

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আরও কয়েকটি ছোট কিন্তু চমৎকার জাদুঘর রয়েছে। তার মধ্যে **Cabinet of Physics Museum** এবং **Cabinet of Curiosities** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিউরিওসিটিজ জাদুঘরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা বিচিত্র সব বস্তু রাখা আছে – স্টাফ করা প্রাণী, অদ্ভুত সব নিদর্শন, বিরল পাথর, খনিজ এবং নানা অদ্ভুত সংগ্রহ।

অন্যদিকে **Cabinet of Physics** যেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক জানালা। বহু শতাব্দী আগে পদার্থবিদ্যা শেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহার করা হতো, সেগুলো আজও যত্ন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেই পুরোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম, কত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে এসে পৌঁছেছে।

কোইমব্রায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমাদের সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল। ইতিহাস, শিক্ষা, স্থাপত্য আর বিজ্ঞানের এমন সুন্দর সমন্বয় খুব কম শহরেই দেখা যায়।

পোর্তো: নৌকা আর সেতুর শহর

লিসবন পর্তুগালের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর হলেও, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোর্তোর চরিত্র একেবারেই আলাদা। ডৌরো (**Douro**) নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহর যেন ইতিহাস আর প্রাণচাঞ্চল্যের এক অপূর্ব মিশেল। ডৌরো নদীর উৎপত্তি স্পেনে। তারপর আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে নদীটি পর্তুগালের বুক চিরে বয়ে এসে পোর্তোতে আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে।

১৭৫৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে লিসবনের অধিকাংশ অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আজ যে লিসবন আমরা দেখি, তার অনেকটাই সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে গড়ে ওঠা। কিন্তু পোর্তো সেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাই শহরটি এখনও তার বহু পুরনো রূপ ধরে রেখেছে, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতাও নিঃশব্দে তার ফাঁকে ফাঁকে জায়গা করে নিয়েছে।

পোর্তোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাগুলোর একটি হলো **রিবেইরা (Ribeira)** – ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রঙিন বাড়িগুলো নেমে এসেছে নদীর ধারে। তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু, এবার খেবড়ো পাথরের রাস্তা, যেগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় গন্তব্যের চেয়ে পথটাই যেন বেশি মধুর। নদীর ধারে সারি সারি ক্যাফে আর রেস্তোঁরা। দাম হয়তো একটু বেশিই, কিন্তু সামনে এমন দৃশ্য থাকলে সেই হিসাব খুব একটা মনে থাকে না।

পোর্তোর রিবেইরা

নদীর পাড়ে বাঁধা থাকে রঙিন **রাবেলো (Rabelo)** নৌকাগুলো। এক সময় এগুলোতেই ডৌরো উপত্যকার আঙুর বাগান থেকে পোর্ট ওয়াইনের পিপে ভাসিয়ে আনা হতো পোর্তোতে। আজ আর সেই কাজ হয় না। নৌকাগুলো এখন নদীর বুকে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে – পোর্তোর প্রতীক হয়ে, ঠিক তার সেতুগুলোর মতোই।

নদীর ওপর পাড়ের শহরটির নাম গাইয়া। ডৌরো নদীর ওপারে রয়েছে **ভিলা নোভা দে গাইয়া (Vila Nova de Gaia)**। এখানেই বিখ্যাত পোর্ট ওয়াইনের গুদাম বা ওয়াইন লজগুলো, যেখানে বহু প্রজন্ম ধরে এই অঞ্চলের বিখ্যাত ওয়াইন সংরক্ষণ ও এজিং করা হয়। নদীর দুই তীর থেকেই শহরের দৃশ্য অসাধারণ, বিশেষ করে বিকেলের আলো যখন ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের সোনালি আভায় বদলে যেতে থাকে।

ডৌরো নদীর উপর মোট ছয়টি সেতু পোর্তো আর গাইয়াকে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত **পন্তে দম লুইস প্রথম (Ponte Dom Luís I)**। বিশাল ইস্পাতের ট্রাস কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সেতুর দুটি তলা। উপরের ডেক দিয়ে চলে শহরের লাইট রেল আর পথচারীরা, আর নিচের ডেক দিয়ে চলাচল করে গাড়ি ও মানুষ।

সেতুর খোলা ইস্পাতের কাঠামো দেখলে অনেকেরই আইফেল টাওয়ারের কথা মনে পড়ে। তাই অনেকেই ধরে নেন,

এটি নিশ্চয়ই গুস্তাভ আইফেলের নকশা। কিন্তু তা নয়। সেতুটি ডিজাইন করেছিলেন **থিওফিল সেয়রিগ (Théophile Seyrig)** – যিনি একসময় আইফেলের সহযোগী এবং ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। মজার বিষয় হলো, আইফেলের এন্ট্রিকে হারিয়ে সেয়রিগের নকশাই নির্বাচিত হয়েছিল, কারণ তাঁর নকশায় ছিল দুই স্তরের সেতু – যা আজ এই সেতুর সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে গাইয়া শহরের **জার্দিম দো মোরো (Jardim do Morro)** পার্কে ভিড় জমে যায়। সবাই অপেক্ষা করে শেষ বিকেলের সোনালি আলোয় পোর্তো, নদী আর সেতুগুলোর রং বদলে যাওয়া দেখার জন্য।

আমি অবশ্য সেখানে পৌঁছাতে একটু দেরিই করে ফেলেছিলাম। নদীর ধারের রাস্তা থেকে দৌড়ে ফিউনিকুলারে চড়ে পাহাড়ের ওপরে উঠলাম। তারপর তাড়াহুড়ো করে সেতুর উপরের ডেকে ওঠার রাস্তা খুঁজে নিয়ে কোনোমতে পৌঁছালাম, ঠিক যখন সূর্যাস্তের শেষ আলো মিলিয়ে গিয়ে আকাশে রয়ে গেছে তার মৃদু আভা। ধীরে ধীরে শহরের আলো জ্বলতে শুরু করল, আর সেই উঁচু জায়গা থেকে বিশাল সেতুটিকে আরও বেশি মহিমান্বিত, আরও বেশি শক্তিশালী মনে হচ্ছিল।

তবু আমার কাছে ছবিটা সম্পূর্ণ করেছিল নদীর ধারে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রঙিন নৌকাগুলো। পুরনো শহর আর তার মনোমুগ্ধকর সেতুগুলোকে পেছনে রেখে তারা যেন এক নিখুঁত দৃশ্য তৈরি করেছিল – একটি শহরের, যার ইতিহাস, জীবন আর পরিচয় চিরকালই তার নদীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

আলগার্ভ: পর্তুগালের সমুদ্র, পাহাড় আর ধীরে চলা জীবন

পর্তুগালের মানচিত্রটা অনেকটা একটা লম্বা আয়তক্ষেত্রের মতো। উপর থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নামলে রাজধানী লিসবন। লিসবনের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল, সেটিই **আলগার্ভ (Algarve)**। "আলগার্ভ" নামটি এসেছে আরবি শব্দ **আল-গার্ব (Al-Gharb)** থেকে, যার অর্থ "পশ্চিম"। মুসলিম শাসনামলে আইবেরীয় উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলকে এই নামে ডাকা হতো। আজ সেই নামই পর্তুগালের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম উপকূলীয় অঞ্চলের পরিচয় বহন করছে।

পর্তুগালের অন্যান্য জায়গা, যেমন লিসবন বা পোর্তো, মূলত শহরকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা দেয়। সেখানে ইউরোপীয় শহরের পরিচিত পরিবেশ, ইতিহাস আর নগরজীবনের সৌন্দর্য। কিন্তু আলগার্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ।

এখানকার পরিচয় হলো সমুদ্রের ধারে খাড়া চুনাপাথরের পাহাড়, সেই পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকা অপূর্ব বিচ, আর উপকূলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা জেলেদের ছোট ছোট বসতি। এই সবকিছু মিলিয়েই আলগার্ভকে পর্তুগালের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চলে পরিণত করেছে। বিশেষ করে আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপ থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন কয়েক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে। শান্ত পরিবেশে বিশ্রাম নেওয়া, সমুদ্রের ধারে সময় কাটানো আর ধীর ছন্দে জীবন উপভোগ করাই যেন এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য। এই অঞ্চলে নতুন বাড়ি আর ভিলার নির্মাণও চোখে পড়ার মতো, আর তার বড় অংশই কিনে নিচ্ছেন বিদেশিরা।

আমরাও এই অঞ্চলে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং একটি ছোট্ট গ্রাম **বুর্গাউ (Burgau)**-এর একটি চমৎকার **Airbnb**-তে কয়েক দিন ছিলাম। সেখান থেকে আশেপাশের আরও কয়েকটি উপকূলীয় শহর – **লাগোস (Lagos)**, **সালেমা (Salema)** এবং **সাগ্রেস (Sagres)** – ঘুরে দেখেছিলাম।

সাগ্রেস ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের অন্যতম শেষ ভূখণ্ড। এখানেই রাজপুত্র **হেনরি দ্য ন্যাভিগেটর** নৌ-চলাচল ও সমুদ্র অভিযানের জন্য তাঁর বিখ্যাত নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক স্থানের কিছু নিদর্শন আজও এই উপদ্বীপে দেখা যায়। এখান থেকেই পর্তুগালের বহু সমুদ্র অভিযান শুরু হয়েছিল, যা একসময় বিশ্বের মানচিত্রই বদলে দিয়েছিল।

আলগার্ভে আমাদের বেশির ভাগ সময় কেটেছে পাহাড়ের কিনারা ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সমুদ্রের দিকে হঠাৎ নেমে যাওয়া খাড়া পাথুরে দেওয়ালগুলো দেখে বারবার বিস্মিত হয়েছি। ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে আছড়ে পড়া ঢেউ, পাহাড়ের গায়ে উড়ে বেড়ানো সিগাল আর নানা ধরনের সামুদ্রিক পাখি, আর নীচের স্বচ্ছ নীল জলে মানুষের সাঁতার কাটা – সব মিলিয়ে দৃশ্যগুলো ছিল অপূর্ব। কোথাও কোথাও সাহসী মানুষদের সেই খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও দেখেছি।

একদিন আমরা একটি নৌকায় চড়ে উপকূল বরাবর ঘুরেছিলাম। নিচ থেকে পাহাড়গুলোর দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। উপরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখা যায়, নিচে সমুদ্রের বুক থেকে তা সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগে। পাথরের গঠন, গুহা, খাঁজ আর রঙের পরিবর্তন – সবকিছুই যেন নতুন করে ধরা দেয়। লিসবন আর পোর্তোর শহুরে অভিজ্ঞতার তুলনায় আলগার্ভ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এখানে ইতিহাসের চেয়ে প্রকৃতি বেশি কথা বলে, আর স্থাপত্যের চেয়ে সমুদ্র।

এই পুরো পর্তুগাল ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরেছিলাম ভরা মন নিয়ে। শুধু সুন্দর কিছু জায়গা দেখেই নয়, বরং এমন এক জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যেখানে মানুষ অকারণে দুশ্চিন্তা করে না, জীবনকে একটু ধীরে, একটু স্বস্তিতে উপভোগ করতে জানে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ফুড ট্যুরের গাইডের একটি কথা বারবার মনে পড়ে। সে বলেছিলো পর্তুগিজদের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে – **"Let the problem walk."** অর্থাৎ, দূরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে সেটাকে সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। অন্যের ব্যাপারে অযথা নাক গলান না, কিংবা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় নিজেকে অকারণে ক্লান্তও করেন না। বরং ভাবেন, সমস্যা যখন সত্যিই সামনে আসবে, তখন তার মোকাবিলা করা যাবে। এর মধ্যে হয়তো সমস্যাটাই নিজের পথে হেঁটে চলে যাবে, কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গুরুত্ব কমে যাবে।

আলগার্ভে coast

আমাদের কাছে এই জীবনদর্শনটি ছিল একেবারেই নতুন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন থাকার পর, যেখানে প্রতিটি সমস্যাকে সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক, সেখানে এই ধীর, নিশ্চিন্ত, অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। হয়তো এ কারণেই পর্তুগাল থেকে আমরা শুধু কিছু সুন্দর ছবি নিয়ে ফিরিনি; ফিরেছি জীবনকে একটু অন্যভাবে দেখার এক নতুন শিক্ষা নিয়েও।

শেখর গুহ

বাংলার বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী – কে. এস. কৃষ্ণণ

রামন এফেক্ট বা রামন প্রক্রিয়া বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী এক আবিষ্কার। ১৯২৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা শহরের বৌবাজার স্ট্রিটে এই আবিষ্কারটি করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ও কারিয়ামনিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণণ। রামনের বিশ্বজোড়া সুনাম ও খ্যাতির আড়ালে কৃষ্ণণের নামটা হয়তো একটু চাপা পড়ে গেছে। বিজ্ঞানী মহলে তিনি শুধু রামনের সহযোগী হিসেবেই নয়, পরবর্তী জীবনে তার স্বতন্ত্র নানান অবদানের জন্যও স্বীকৃত। ভারতে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজেও তার বিরাট ভূমিকা ছিলো, যে কারণে তিনি ভারতরত্ন, ভাটনগর পুরস্কার ইত্যাদি নানা সম্মান পেয়েছেন।

বাংলার সঙ্গে তার বহুবছরব্যাপী প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিলো, কিন্তু এখনকার বাঙালিদের কাছে তিনি খুব একটা পরিচিত মনে হয়না। তার জীবন ও কাজ সম্বন্ধে আমার মতোই আরও কেউ কৌতূহলী হতে পারেন ধরে নিয়ে সে বিষয়ে এখানে একটু লিখছি।

১৯৬১ সালে নয়াদিল্লিতে কৃষ্ণণের মৃত্যুর পরে তার বৈজ্ঞানিক জীবনচরিতের একটি খসড়া ১৯৬৩ সালে লেখেন হোমি ভাবা, কিন্তু সেটি শেষ করার আগেই ভাবা ১৯৬৬ সালে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া জীবনীটি শেষ করে রয়াল সোসাইটির বিবরণীতে তা প্রকাশ করেন ব্রিটেনের বিজ্ঞানী ক্যাথলিন লন্সডেল (Kathleen Lonsdale)। সেই বিশদ লেখাটি, এবং জি এইচ কেসওয়ানির লেখা রামনের জীবনী হলো এই লেখাটির মূল তথ্যসূত্র ।

প্রথম জীবন, ১৮৯৮-১৯২০

ভাবা ও লন্সডেলের লেখা অনুযায়ী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে, দক্ষিণ তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলায় এক গ্রামে কৃষ্ণণের জন্ম হয়।

তার বাবা ছিলেন পুরোনো দিনের সংস্কৃত ও তামিল ভাষার পন্ডিত, ধর্মীয় সাহিত্যে তার ছিলো গভীর জ্ঞান। বাবার থেকে কৃষ্ণণও পেয়েছিলেন ধর্ম ও দর্শনে তার অনুরাগ আর তামিল সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষায় তার জ্ঞান। তার মা ছিলেন অতি বুদ্ধিমতী এবং সুশৃঙ্খল মহিলা, এবং কৃষ্ণণ অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ার পরে তিনিই তাকে বড়ো করেন।

গ্রামের পাঠশালার পরে কৃষ্ণণ কাছের শ্রীভিল্লিপুর শহরে হিন্দু হাই স্কুলে ভর্তি হন। আকাশবাণীতে প্রচারিত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে প্রতিদিন তাদের তালপাতার পুঁথিতে দু তিন পাতা করে লিখতে হতো নানান তথ্য নিয়ে। বছরের শেষে সেটাই হয়ে উঠতো একটা বই। তাতে ছিলো কিভাবে বিভিন্ন নক্ষত্র মন্ডলীগুলিকে চিহ্নিত করা যায় এবং আকাশে তাদের অবস্থান থেকে সময়ের মাপ করা যায় তা মনে রাখার সহজ উপায়। বহু বছর পরে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার সময়ে সেই তালপাতার পুঁথিতে লেখা নিয়মগুলো তার কাজে লেগেছে।

১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মাদুরাই শহরে আমেরিকান কলেজ ও তারপরে তখনকার ম্যাড্রাস, এখনকার চেন্নাই শহরের খ্রিস্টান কলেজে পড়ে কৃষ্ণণ পদার্থবিদ্যায় বি এ পাশ করেন। একটা মজার ঘটনা হলো, ১৯১৮ সালে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য অ্যাবারডিন পুরস্কার পেয়েও তিনি

ইংরিজিতে ফেল করার জন্য ওই বছরে বি এ ডিগ্রী পাননি। মনের দুঃখে তিনি গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু শিক্ষকদের আগ্রহে পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে তিনি সে ডিগ্রী অর্জন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত হন কলেজের রসায়ন বিভাগে প্রদর্শক বা ডেমন্সট্রেটরের কাজে।

সে কাজে দক্ষতার জন্য কৃষ্ণণ খুব তাড়াতাড়ি ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিভাবে গুছিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল লিখে রাখতে হয় সেটা তিনি শেখাতেন, ও নিজেও সারা জীবন সেভাবেই কাজ করেছেন। দুপুরের খাওয়ার সময়টাতে তিনি চালু করলেন নিয়মিত পদার্থবিদ্যায় বক্তৃতার পালা। প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব তিনি বোঝাতেন বলে সে বক্তৃতাগুলির কথা ছড়িয়ে পড়লো, আর শহরের অন্য কলেজের পড়ুয়ারাও ভিড় করে সেগুলি শুনতে আসতো। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর গণিতের যেকোন প্রশ্ন তাকে করা হতো, তিনি তখনই সেগুলো কষে দেখাতেন। শুধু বোঝানোর ক্ষমতা নয়, তার হাসিখুশি সুন্দর স্বভাবেও মুগ্ধ হতো ছাত্ররা।

১৯১৯ সালে বি এ পাশ এবং বিয়ে, দুটো কাজই করেছিলেন কৃষ্ণণ। পরের বছর তিনি চেষ্টা করেছিলেন কোডাইকানালে সৌর মানমন্দিরে কাজে ঢোকার, কিন্তু কোন কারণে সে কাজটা তিনি পেলেন না।

সেটা যে তার পক্ষে কতো ভালো হয়েছিলো তখন তিনি হয়তো সেটা বোঝেন নি।

ম্যাড্রাসের কনেমারা লাইব্রেরিতে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র নিয়মিত পড়তেন কৃষ্ণণ। আলোকবিজ্ঞান, তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব, আপেক্ষিকতা, পারমাণবিক ও আণবিক বিজ্ঞান এ সবেতেই ছিলো তার আগ্রহ। কলকাতা তখন ভারতীয় বিজ্ঞানের কেন্দ্র। সেখান থেকে লেখা রামনের গবেষণাপত্র গুলি তিনি মন দিয়ে পড়তেন। ১৯২০ সালে দক্ষিণ ভারত চিরতরে ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন কৃষ্ণণ। তার উদ্দেশ্য – রামনের সঙ্গে কাজ করা।

কলকাতায়, ১৯২০-১৯৩৩

সরকারি কাজে নিয়োগের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে, অর্থ দপ্তরের উপপ্রধান পদে যোগ দিতে ১৯০৭ সালে তামিলনাড়ু ছেড়ে ভারতের রাজধানী কলকাতায় চলে এসেছিলেন রামন।

সেই বছরেই, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অমৃতলাল সরকারের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে তিনি ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত গালভরা নামের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কালটিভেশন অফ সায়েন্স, বা সংক্ষেপে কাল্টিভেশনে গবেষক হিসাবে যোগ দিলেন। বৌবাজার স্ট্রিটের ওই প্রতিষ্ঠানের তিনিই প্রথম নিয়মিত কাজে আসা গবেষক, যদিও তিনি কাজে আসতেন সরকারি কাজ মিটিয়ে, দিনের শেষে। ১৯০৭ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিউটনীয় বলয় নিয়ে লেখাটিই কাল্টিভেশন থেকে প্রকাশিত প্রথম গবেষণাপত্র।

১৯১৭ সালে রামন একই সাথে রাজাবাজারে সায়েন্স কলেজে পালিত অধ্যাপক হয়ে যোগ দিলেন, জগদীশ চন্দ্র সে পদে নিয়োগের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার পরে।

১৯২০ সালে কলকাতায় এসে কৃষ্ণণ যখন রামনের গবেষণাগারে কাজ করতে চাইলেন, রামন তাকে সরাসরি গবেষণাতে না নিয়ে আগে সায়েন্স কলেজে এম এ পড়তে বললেন। সেখানে কৃষ্ণণের অধ্যাপক ছিলেন রামন নিজে, এবং তার সঙ্গে শিশির কুমার মিত্র, দেবেন্দ্র মোহন বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, ইত্যাদি দিকপাল বিজ্ঞানিরা।

কৃষ্ণণের মেধা ও গবেষণায় আগ্রহ দেখে রামন তাকে তার কাল্টিভেশনের গবেষণাগারে নিয়ে এলেন, এম এ পরীক্ষায় বসার আগেই। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে সেখানে যোগ দিলেন কৃষ্ণণ।

আকাশের রঙ নীল কেন, ১৮৭১ সালে তা প্রথম ঠিক ভাবে বুঝিয়েছিলেন লর্ড র‍্যালে (John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh)। কিন্তু সমুদ্রের রঙ নীল বা নীলচে সবুজ কেন হয় তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটা তখনও জানা ছিলো না।

শুধু জল নয়, যেকোন তরল পদার্থ থেকেই আলোর বিক্ষেপণ (বা scattering) কিভাবে হয় তা নিয়ে আগ্রহভরে গবেষণা করছিলেন রামন।

১৯২২ সালে, আমেরিকার সেন্ট লুইস শহরে বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটন (Arthur Compton) দেখিয়েছিলেন যে পদার্থ থেকে বিক্ষেপিত হলে এক্স রে, (বাংলায় যার নাম রঞ্জন রশ্মি), তার খানিকটা শক্তি হারাতে পারে, সেই হারানো শক্তিটুকু পদার্থের ইলেকট্রন নিয়ে নেওয়ার ফলে।

রামন (এবং অন্য বিজ্ঞানীরাও) বুঝেছিলেন যে এক্স রে আর আমাদের চোখে দেখা সাধারণ আলো দুটোই যখন আদতে একই জিনিস, অর্থাৎ দুটোই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, তখন কোন এক রঙের 'আলো' একটা পদার্থের গায়ে পড়লে তা থেকে বিক্ষেপিত আলোর খানিকটা হবে অন্য রঙের।

সেটা হাতে কলমে দেখানোর চেষ্টা চলছিলো পৃথিবীতে নানা জায়গায়, বিশেষ করে কলকাতায় বৌবাজারে, রামনের গবেষণাগারে।

১৯২৩ সালে রয়াল সোসায়েটির ফেলো নির্বাচিত হলেন রামন, ও তারপরে তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে লম্বা পাড়ি দিতে গেলেন। তার জায়গায় গবেষণাগারটি চালানোর ভার নিলেন কৃষ্ণণ।

গোড়ায় তিনি থাকতেন গবেষণাগার সংলগ্ন ছাত্রাবাসে। রোজ ভোর ছটায় কাজে চলে আসতেন তিনি – তারই মধ্যে গঙ্গাপারে এক চক্কর ঘুরে এসে। সারাদিন কাজের পরে, ইডেনে বা ময়দানে সহকর্মীদের সাথে উৎসাহভরে ফুটবল খেলাও তিনি দেখতে যেতেন। কৃষ্ণণের আরো একটি গুণের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। তিনি খুব ভালো গল্প বলতে পারতেন আর তার ভান্ডারে ছিল প্রাচীন তামিল ও সংস্কৃত সাহিত্যের অজস্র গল্প, যেগুলি তার বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে শুনত।

অনেক কলকাতাবাসীর মতোই তিনি ছিলেন তীব্র জাতীয়তাবাদী, আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো তিনিও ছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে বিশ্বাসী। তামিল ভাষাতেই তিনি তার প্রথম গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন। তবে সেটার খোঁজ আমি পাইনি।

তার আকাশবাণীতে প্রচারিত স্মৃতিচারণে কৃষ্ণণ বলেছেন যে কলকাতায় এসে তিনি বিদেশী সাহিত্যপাঠ শুরু করলেন, এবং তখন থেকে সেরভান্তেস, ডুমা, সুইফট, থ্যাকারে, লুইস ক্যারল, ডিকেন্স, বার্নার্ড শ ইত্যাদিরা তার প্রিয় লেখক হয়ে উঠলেন। ডন কিহোতে বইটি ছিলো তার বিশেষ পছন্দের, সেটি তিনি পরেও অনেকবার পড়ে আনন্দ পেয়েছেন।

তারই সঙ্গে গণিত ও বিজ্ঞানের উঁচুমানের বইগুলি, বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের জীবনী এগুলোও তিনি মন দিয়ে পড়তেন। লর্ড র‍্যালের কাজের সামগ্রিক সংগ্রহ তখন থেকে তার প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠেছিলো – আর আইনস্টাইন বোর ইত্যাদির সমসাময়িক লেখা তার অবশ্যপাঠ্য তো ছিলোই।

তার গবেষণাপত্রপঞ্জী ঘাঁটলে দেখা যায় যে তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় একটি করে গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। বাকিগুলি সবই ইংরিজিতে লেখা।

গণিতে আগ্রহের জন্য কৃষ্ণণের ঝোঁক ছিলো তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার কিন্ত রামন তাকে পরীক্ষামূলক কাজের দিকে আসতে প্রভাবিত করলেন।

সে কাজে তার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার ১৯২৫ সালে ফিলোসফিকাল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গবেষণাপত্রটি থেকে। এই কাজটি তিনি ১৯২৪ সালে বেশ কয়েকমাস ধরে একাই করেছিলেন, রসায়ন, কারিগরি এবং আলোকবিদ্যায় অসামান্য দক্ষতা কাজে লাগিয়ে।

রামন দেশে ফেরার পরে, তিনি ও কৃষ্ণণ পরের বছর দুই একসঙ্গে নানা কাজে মন দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র তরল পদার্থে আলোর বিক্ষেপণ নিয়েই নয়, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন পদার্থের বাধা পেরিয়ে আলোর অপবর্তন (বা diffraction)-তত্ত্ব, গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন পদার্থে চুম্বকীয় প্রভাব এসব নিয়ে তারা দুজনে ১৯২৬ সালে চারটি, আর ১৯২৭ সালে ৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি কৃষ্ণণের একার লেখা, এবং দুটি প্রকাশিত হয়েছিলো নেচার পত্রিকায়।

১৯২৭ সালের শেষ দিকে একটা ঘটনায় তাদের টনক নড়ে উঠলো। নভেম্বর মাসের একদিন রামন অফিস ঘরে তার দাদা চন্দ্রশেখর আয়ারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এই দাদারই ছেলে হলেন সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর, যিনি পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন এবং ১৯৮৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। অবশ্য তার আরও বড় সম্মান হলো ঘঅঝঅর এক্স-রে দূরবীন বসানো কৃত্রিম উপগ্রহ 'চন্দ্র' তারই নাম বহন করছে।

যাই হোক এসব তো অনেক পরের কথা, সেদিন তাদের গল্পের মধ্যে ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণণ এবং উত্তেজিত হয়ে তাদের জানালেন যে খবর এসেছে আর্থার কম্পটন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ব্যাপারটার তাৎপর্য রামন সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন এবং তারা স্থির করলেন যে আর দেরি করা যায় না। যে করে হোক তাদের তাড়াতাড়ি দেখাতে হবে যে শুধু এক্স রে নয়, দৃশ্যমান আলোতেও কম্পটনের প্রক্রিয়াটা কাজ করে। তারা না করলে সে কৃতিত্বটা অর্জন করে নেবে অন্য কোন দেশে অন্য কেউ।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে প্রথম কিছু করার গৌরব অর্জন করতে গেলে শুধু প্রতিভা অন্তদৃষ্টি ধৈর্য আর দক্ষতা থাকলেই চলে না। তার সঙ্গে লাগে আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যা পেতে লাগে টাকা, সব দেশে সব সময়েই যা প্রতিদ্বন্দীদের সঙ্গে লড়াই করে বিজ্ঞানীদের জিততে হয়। রামনকেও সেকাজ করতে হয়েছিলো।

১৯২৩ সালে রামনের প্রাক্তন ছাত্র রামনাথন রেঙ্গুন থেকে কলকাতা এসেছিলেন, ও শখ করে কাল্টিভেশনে এসে কাজ করতেন। সম্ভবত তিনিই তখন প্রথম দেখেছিলেন যে তরল পদার্থে একরঙা আলো পড়লে বিক্ষেপিত আলোয় থাকে অন্য রঙের ক্ষীণ আভা। সেই আভাটির রং কী,তা নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট না করলে আবিস্কারটি সম্পূর্ণ হয় না। শুধু কম দামি রঙিন ফিল্টার ব্যবহার করে সেই আলোকে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছিল না। তা করার জন্য প্রয়োজন দামি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা স্পেকট্রোগ্রাফ।

ইংল্যান্ডের অ্যাডাম হিলগার কোম্পানির বানানো মাঝারি মানের একটা স্পেকট্রোগ্রাফ কেনার আবেদন করেছিলেন রামন। তা মঞ্জুর করতে গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওই যন্ত্রটি কি কাজে লাগবে? তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং গভীর আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন রামন তাকে বলেছিলেন যে ওই যন্ত্রটি নোবেল পুরস্কার এনে দেবে।

১৯২৮ সালে সে যন্ত্রটি তাদের গবেষণাগারে এসে গেছিল। কিন্তু শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়, বিক্ষেপিত অন্য রঙের আলো এতই ক্ষীণ যে তা দেখার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটা জোরালো তেজী আলোর উৎস।

সেজন্য তারা কাজে লাগাতেন সূর্যের আলো, গ্রীষ্মের কলকাতায় যা ছিল অপর্যাপ্ত। কিন্তু শীতের দিনে একে তো আলোর তেজ অনেক কম, তার উপর দিন ছোট বলে একনাগারে কাজ করার সময়টাও কম হতো।

তাই রামন কিনেছিলেন একটি পারদ বাতি (mercury lamp)। সেটা কাজে লাগানো হলো ১৯২৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি।

সেদিনটার কথা কৃষ্ণণের ডায়েরি থেকে পাওয়া যায়। বাড়িতে একটি উৎসব থাকায় তিনি সেদিন সকালে কাজে আসতে পারেননি। দুপুরবেলা এসে দেখেন গবেষণাগারে বেশ উত্তেজনা। সে দিনটা ছিল মেঘলা। সূর্যের আলোর জন্য অপেক্ষা না করে অধৈর্য হয়ে রামন কাজে লাগিয়েছেন নতুন আসা পারদ বাতিটি, এবং তার মনে হচ্ছে যে স্পেকট্রোগ্রাফ দিয়ে তিনি বিক্ষেপিত আলোর রংটি বুঝতে পারছেন। রামনকে অন্য কাজে চলে যেতে হল বলে কৃষ্ণণ কাজটি হাতে নিলেন এবং সেদিন সন্ধ্যের মধ্যে বের করে ফেললেন দুটি তরল থেকে বিক্ষেপিত অন্য রঙের আলোর নির্দিষ্ট রংটি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের পরীক্ষার ফলাফল লিখে তারা সেটা পাঠিয়ে দিলেন নেচার পত্রিকায় এবং চির বিখ্যাত হয়ে রইল রামন এবং কৃষ্ণণের লেখা সেই গবেষণাপত্রটি।

তারপরে বাকি গোটা ১৯২৮ সাল ধরে এই বিষয়ে রামন ও কৃষ্ণণ ১৩ টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং তার মধ্যে সাতটি প্রকাশিত হয় নেচার পত্রিকায়।

১৯২৮ সালে অক্টোবর মাসে মেঘনাদ সাহা ও রামনের আমন্ত্রণে মিউনিখ থেকে কলকাতায় আসেন আর্নল্ড সোমেরফেল্ড (Arnold Sommerfeld)। তিনি ছিলেন নামজাদা বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, যার কাছে ইউরোপ আমেরিকার সেরা ছাত্ররা কাজ করতে আসতো, যেমন হাইসেনবের্গ (Werner Heisenberg), পাউলি (Wolfgang Pauli) ও পাউলিং (Linus Pauling)।

অরূপ রতন ভট্টাচার্যের লেখা মেঘনাদ সাহার জীবনীতে সোমেরফেল্ডকে নিয়ে একটি চমকপ্রদ গল্প আছে। মিউনিখ শহরে সোমেরফেল্ডই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার পরিচয় করিয়ে দেন। তার আগে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদের কথা জানতেন না।

১৯২১ সালে সোমেরফেল্ড মেঘনাদের একটি গবেষণাপত্র পড়ে সেটির মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে বছরে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন মিউনিখে এবং সোমেরফেল্ড নিজে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মেঘনাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। মেঘনাদ তখন বার্লিনে ছিলেন। সোমেরফেল্ডের আমন্ত্রণে তিনি মিউনিখে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন।

কলকাতায় এসে সোমেরফেল্ড আধুনিক তরঙ্গতত্ত্ব নিয়ে সাতটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রথম সারিতে বসে সেগুলি মন দিয়ে নোটবদ্ধ করে রেখেছিলেন কৃষ্ণণ, এবং পরে তার মধ্যে পাঁচটির অঙ্কগুলো নিজে অন্যভাবে সমাধান করে সোমেরফেল্ডকে দেখিয়েছিলেন। তা দেখে মুগ্ধ হয়ে সোমেরফ্রেল্ড প্রস্তাব করেছিলেন দুজনে মিলে সেটি একটি বই হিসেবে ছাপানোর। কিন্তু কোন কারণে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

১৯২৯ সালে চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন কৃষ্ণণ। তার মধ্যে একটি রামনের সঙ্গে লেখা, একটি রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে লেখা এবং বাকি দুটির লেখক তিনি একা। সেই একা লেখা গবেষণাপত্রদুটির মধ্যে একটি হলো ক্রিস্টালের থেকে আসা রামন বর্ণালী।

ব্যাস এই শেষ – তারপরে তার আরো ৩২ বছর ব্যাপী বাকি কর্মজীবনে রামন প্রক্রিয়া নিয়ে আর কোন কাজ তিনি প্রকাশ করেননি। মনে করা হয় রামনের প্রবল ব্যক্তিত্বের ছায়ার বাইরে এসে কৃষ্ণণ নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

১৯২৯ সালে নিলস বোর (Niels Bohr) ও শার্ল ফাব্রি (Charles Fabry) রামনকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করলেন, কিন্ত সে বছর পুরস্কারটা পেলেন ফরাসি বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রলিয়ে (Louis de Broglie)। পরের বছর

বোর ও ফাব্রি র সঙ্গে তার মনোনয়নে যোগ দিলেন আরনেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford), ইয়োহানেস স্টার্ক (Johanes Stark) এবং দ্য ব্রলিয়ে নিজেই, এবং তার জোরে রামন একাই লাভ করলেন পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার – আশুতোষের কাছে তার দেওয়া কথাটা রেখে।

নোবেল পুরস্কার এবং তার নামের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রামন পেলেন কিন্তু সত্যের খাতিরে একটা কথা না উল্লেখ করে উপায় নেই। রামন এবং কৃষ্ণণের যে কাজটি রামনকে এত সম্মান এনে দিয়েছে সেটি তাদের করার এক সপ্তাহ আগেই গবেষণাগারে করে ফেলেছিলেন মস্কো শহরে দুই বিজ্ঞানী, গ্রিগরী লান্ডসবার্গ এবং লিওনিড মান্ডেলস্টাম। তারাও আবিষ্কারটির গুরুত্ব বুঝে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলকে তখনই সে বিষয়ে জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাদের মনোনীত করেছিলেন কেবল দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী, যাদের খুঁটির জোর ছিল কম, তাই পুরস্কারটি শুধু রামনই পেলেন। তাদের নামগুলি ধামাচাপা পড়ে যাওয়াটা অনেকের কাছেই একটু অবিচার বলে মনে হয়।

নোবেল পুরস্কারের প্রতিযোগিতা ও ঢাকঢোলের বাইরে, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত, ফলপ্রসু ও পরিপূর্ণ বাকি জীবনটা কাটালেন কৃষ্ণণ।

ঢাকা – ১৯২৯ - ১৯৩৩

১৯২৯ সালে সত্যেন বসুর আমন্ত্রণে কৃষ্ণণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ে রিডার হিসেবে যোগ দিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন প্যারিস ও বার্লিনে বছর দুই কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন, ও ঢাকায় পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান হয়ে সে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলছেন।

ঢাকায় অধ্যাপনা ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশ কৃষ্ণণের খুবই পছন্দ হয়েছিলো। পদার্থের চুম্বকীয় ধর্ম নিখুঁতভাবে মাপার নানা নতুন উপায় বার করলেন তিনি। তার তিনজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন শান্তিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়নান্দ বসু ও ভগবতী চরণ গুহ। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে এদের সঙ্গে, আরো পাঁচজন বাঙালি ছাত্র ও সহযোগীর সঙ্গে এবং নিজে একাও কৃষ্ণণ প্রকাশ করেন ১৬ টি গবেষণা পত্র।

১৯৩৩ সালে রামণ কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যান। কাল্টিভেশনে তার জায়গায় মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় কৃষ্ণণকে।

ঢাকা থেকে তার সঙ্গে কলকাতা আসেন অক্ষয় বসু। আর ভগবতী চরণ মেদিনীপুর কলেজে অধ্যাপক হয়ে চলে যান এবং সেখান থেকে ১৯৩০ এর দশকেই নানা গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। আইআইটি খড়্গপুর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেও যে মেদিনীপুর জেলা থেকে বিজ্ঞানের প্রথম সারির কাজ প্রকাশিত হতো এটা খুবই গৌরবের মনে হয়।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪২ – আবার কলকাতায়

পুরনো কাজের জায়গায় ফিরে এসে কৃষ্ণণ উৎসাহভরে নতুন গবেষণা শুরু করলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বহু ছাত্র ও সহকর্মীর সঙ্গে তিনি বিভিন্ন পদার্থের, বিশেষ করে গ্রাফাইটের চুম্বকীয় ধর্ম নিয়ে প্রকাশ করেন ৪৭টি গবেষণাপত্র, যার মধ্যে আটটি প্রকাশিত হয় নেচার পত্রিকায়।

সে কাজগুলির উচ্চমান বিশ্বের গবেষণা জগতে স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে কেমব্রিজে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরীতে লর্ড রাদারফোর্ড এবং লন্ডনে রয়াল ইনস্টিটিউশনে উইলিয়াম ব্র্যাগ (William Bragg) তাকে

কয়েকটি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কেমব্রিজে দেওয়া সে বক্তৃতাগুলির সার অংশ ১৯৩৭ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি, বা কেলাসবিদ্যার পথিকৃৎ উইলিয়াম ব্র্যাগের সহযোগী ছিলেন অসামান্য কৃতি বিজ্ঞানী ক্যাথলিন লন্সডেল। কৃষ্ণণ তার বাড়িতেই ওঠেন এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব।

যৌথভাবে তারা একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। শান্তিবাদী ক্যাথলিন কৃষ্ণণের নানা গুণে মুগ্ধ হন এবং এই তামিল ব্রাহ্মণটির দেখাদেখি নিজেও নিরামিষভোজন শুরু করেন।

বৈজ্ঞানিক কাজে তার কৃতিত্বের জন্য তিনি ওই সময়ে বেলজিয়ামে লিজ (Liege) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদক লাভ করেন।

এলাহাবাদ ১৯৪২-১৯৪৮

১৯৩৮ সালে মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। তার পদ টি নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গের (Erwin Schroedinger)কে।

অদ্বৈত বেদান্ত এবং উপনিষদে অনুরাগী শ্রোয়েডিঙ্গের সে পদটি নিতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন। কিন্তু তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার এলাহাবাদে আসা আর হয়নি।

১৯৪২ সাল অবধি পদটি খালি থাকে এবং শ্রোয়েডিঙ্গের আসতে না পারায়, তার জায়গায় সে পদটি নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় কৃষ্ণণকে। এটাও একটি বড়ো সম্মান নিশ্চয়ই।

সে পদটি গ্রহণ করে কৃষ্ণণ কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন এলাহাবাদে। গবেষণার সঙ্গে উচ্চমানের অধ্যাপনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকেও তার মন এলো। নানান প্রশাসনিক দায়িত্ব তার কাঁধে পড়েছিলো এবং দেখা যায় ১৯৪২ ও ৪৩ সালে তার কোন গবেষণাপত্রই প্রকাশিত হয় নি। তবে অগ্রসর ছাত্রদের নিয়ে পদার্থবিদ্যার বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন।

এলাহাবাদে থাকাকালীন যে গবেষণাপত্রগুলি কৃষ্ণণ প্রকাশ করেছেন তা সবগুলি পুরোপুরি তাত্ত্বিক। তার ছাত্র অবধ বিহারী ভাটিয়ার সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন ধাতব পদার্থ ও মিশ্র ধাতুর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি নিয়ে। আইনস্টাইন ও স্মোলুচোস্কির ইলেকট্রন বিক্ষেপণ-তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তারা দেখালেন যে ধাতু ও মিশ্র ধাতুর পরিবাহিতা নির্ভর করে তাদের পরমাণুগুলি কতোটা শৃঙ্খলিত বা বিশৃঙ্খল ভাবে সাজানো, (ইংরিজিতে ordered-disordered) তার উপরে। কঠিন পদার্থের ধর্ম বোঝার কাজে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।

কৃষ্ণণের সঙ্গে কাজ করে তার ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে অবধ বিহারী লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে হের্বের্ট ফ্রোয়েলিখ (Herbert Froelich) ও তার পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাক্স বোর্নের (Max Born) সঙ্গে কাজ করেন। তার একটি স্থায়ী কীর্তি হলো প্রিন্সিপালস অফ অপ্টিক্স নামের বইতে শব্দোত্তর ধ্বনিতরঙ্গ বা আল্ট্রাসাউন্ড ওয়েভ নিয়ে একটি গোটা অধ্যায় লেখা। মাক্স বোর্ন ও রিচার্ড ওয়লফের (Max Born, Richard Wolf) লেখা এই বইটি আলোকবিদ্যার জগতে মহাভারত-তুল্য।

ওই সময়ে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার বাইরে গিয়ে বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন কৃষ্ণণ। ১৯৪৮ সালে তার একটি প্রকাশিত হয় নেচার পত্রিকায়। প্রকাশিত কাজে বিষয়ের এমন ব্যাপকতা পদার্থবিদদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়না।

১৯৪৭ - ১৯৬১, নয়াদিল্লি

এলাহাবাদে এসে কৃষ্ণণের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে নেহরুর অনুরোধে কৃষ্ণণ দিল্লিতে এসে প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরি নামে একটি গবেষণাকেন্দ্র এবং সেখানে প্রধান হয়ে তার বাকি জীবনটি কাটান।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি প্রশাসনের গুরু দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি নিজের গবেষণার কাজও উপেক্ষা করেননি। সেখানকার অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে উদাহরণ হয়ে তিনি সমানে তার নিজের গবেষণা চালিয়ে গেছেন। বহুদিন আগে কলকাতায় যেমন করতেন, তেমনই দিল্লিতেও কাজের জায়গায় প্রতিদিন সকালে তিনিই প্রথম কাজে আসতেন।

১৯৫৫ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস তাকে বার্ষিক অধিবেশনে নৈশভোজে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়।

ভাবা ও লন্সডেল লিখেছেন এটি একটি দুর্লভ সম্মান, যা তার আগে কেবল ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও সুইডেনের রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্টরাই পেয়েছিলেন। তার বক্তৃতায় কৃষ্ণণ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে বলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যার প্রধান এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী জন ভ্যান ভ্লেক (John Van Vleck) ওই বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে কৃষ্ণণের ওই বক্তৃতাই তাকে প্রথম আলফ্রেড নর্থ ওয়াইটহেডের (Alfred North Whitehead) কাজের সঙ্গে পরিচিত করে।

কৃষ্ণণ বিজ্ঞানের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করতেন, এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত গবেষণার মধ্যে কোন বিভেদ আছে বলে মনে করতেন না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন, ও পৃথিবীর নানা দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।

উত্তপ্ত ধাতু, সেমিকন্ডাক্টর ইত্যাদি পদার্থ থেকে বিকিরিত হয় ইলেকট্রন, যা কাজে লাগে জোরালো রেডিও যোগাযোগের প্রযুক্তিতে। এ নিয়ে দেশে বিশদ মৌলিক গবেষণার পত্তন করলেন তিনি, সনৎ কুমার রায়ের সঙ্গে সহযোগিতায়।

উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তাপের বিকিরণ নিয়েও তাত্ত্বিক গবেষণা শুরু করলেন কৃষ্ণণ। ১৯৬০ সালে তিনি একক ভাবে নেচার পত্রিকায় এ নিয়ে মূল্যবান একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। আরো বেশ কিছু গবেষণাপত্রে এ বিষয়ে কাজ তিনি যৌথভাবে প্রকাশ করেছেন সুধাংশু জৈনের সঙ্গে।

দিল্লিতে থাকাকালীন ১৪ বছরে তিনি প্রকাশ করেন ৩৬ টি গবেষণাপত্র। সেগুলোর শেষটি ১৯৬১ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত। সেটি লিখেছিলেন কৃষ্ণণ এবং সুধাংশু জৈন।

অন্য কাজ

কৃষ্ণণের পারিবারিক জীবন ভরপুর ছিল তার স্ত্রী, দুই ছেলে, চার মেয়ে ও নাতি নাতনিদের নিয়ে। তার এক মেয়ে কুমুদিনী বিয়ের অল্প পরেই স্বামীহারা হয়ে একটি মাত্র ছেলে বিজয় তিরুভেদিকে নিয়ে কৃষ্ণণের কাছে থাকতে আসেন। দিল্লিতে লাটিয়েন্স, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ভবন এলাকায় বিজয় তার দাদুর কাছেই বড়ো হন, ও পরে ব্যাঙ্গালোরে প্রকৃতিপ্রেমিক পরিবেশবিদ বিজ্ঞানী হিসেবে তার নাম হয়। কৃষ্ণণের এর কাগজপত্র তিনি সংগ্রহ করে রাখেন।

কৃষ্ণণের এক ছেলে ও এক মেয়ে থাকতেন ইংল্যান্ডে ও ক্যানাডাতে। তাদের ছেলেমেয়েদের তিনি দেখেননি এবং ১৯৬১ সালে সেই নাতিনাতনিদের দেখতে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। সে বছরের ১৪ই জুন হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন কৃষ্ণণ।

কৃষ্ণণের ষাট বছরের জন্মবার্ষিকীতে নেহরু বলেছিলেন যে কৃষ্ণণ একজন মহান বিজ্ঞানী ঠিকই, কিন্তু তিনি তার চেয়েও অনেক বড়। তিনি একজন আদর্শ নাগরিক এবং সম্পূর্ণ মানুষ।

১৯৪২ সালে কৃষ্ণণ কলকাতা ছেড়ে গেলেও তার সঙ্গে সে শহরের সম্পর্ক এখনো একটু টিকে আছে। দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ১৯৪১ সালে কৃষ্ণণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় তামিল সংঘ, প্রবাসে তামিল সংস্কৃতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।

তাদের সভাঘরটি আমাদের বাড়ির পেছনদিক থেকে দেখা যেত, এবং ১৯৬০ -৭০এর দশকে সেখানে নিয়মিত অনুষ্ঠান হতে দেখেছি, যদিও তখন কৃষ্ণণের বিষয়ে কিছুই জানতাম না। সভাঘরটির সামনে ছিল ছোট একটি মাঠ, যেখানে প্রতিবছর ২৬শে জানুয়ারি ও ১৫ই অগস্টে পতাকা উত্তোলন করে তারা জনগণমন গাইতেন।

সে মাঠটি এখন একটি বহুতল বাড়ির নিচে চাপা। কিন্তু ইন্টারনেটে খুঁজে দেখলাম সংঘটি এখনো সেই ঠিকানাতেই রয়েছে।

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পাঠক প্রতিক্রিয়া

'যেমন দেখিয়াছি তাঁকে'

লেখক: নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

প্রকাশ: দেশ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৪৩২

প্রখ্যাত হিন্দি-উর্দু সাহিত্যিক প্রেমচন্দের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত – 'যেমন দেখিয়াছি তাঁকে' এক অনন্য জীবনীভিত্তিক উপন্যাস। লেখক নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য প্রেমচন্দের জীবনকে তুলে ধরেছেন তাঁর সহধর্মিণী শিবরানী দেবীর আত্মকথনের মাধ্যমে। এই অভিনব আখ্যানরীতি উপন্যাসটিকে শুধু তথ্যসমৃদ্ধই করেনি, বরং একে করেছে গভীরভাবে মানবিক ও হৃদয়স্পর্শী।

লেখকের দেওয়া তথ্যসূত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এই উপন্যাস রচনায় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্য ও সৃজনশীল কল্পনার সার্থক মেলবন্ধনে তিনি নির্মাণ করেছেন এক প্রাণবন্ত সাহিত্যজগৎ, যেখানে বাস্তব ও কল্পনা অবলীলায় একাকার হয়ে গেছে। প্রেমচন্দ ও শিবরানী দেবীর জীবনসংগ্রাম, তাঁদের আশপাশের মানুষজন এবং সমকালীন সমাজকে এমন অনায়াস দক্ষতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে, পড়তে পড়তে মনে হয় যেন চোখের সামনে একটি চলচ্চিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্য উন্মোচিত হচ্ছে। এখানেই লেখকের প্রকৃত সার্থকতা।

প্রেমচন্দের শৈশব, বেড়ে ওঠা, বিবাহ, দাম্পত্যজীবন – সবই ধীরে ধীরে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কৈশোরে তাঁর উর্দু ভাষায় লেখালেখি, পরবর্তীকালে সেই রচনার ইংরেজি অনুবাদ, তাঁর সাহিত্যজীবনের বিবর্তন – সবই অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে প্রেমচন্দের সাহিত্যভাবনারও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁর দেবস্থান রহস্য উপন্যাসে পুরোহিততন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে কীভাবে ব্যবসায় পরিণত করা হয়, তার যে নির্মম চিত্র তিনি এঁকেছিলেন, বিস্ময়করভাবে তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আবার প্রেমা উপন্যাসে তিনি বাল্যবিধবার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কথা লিখেছিলেন; শুধু লেখাতেই নয়, বাস্তব জীবনেও তিনি সেই আদর্শকে ধারণ করেন শিবরানী দেবীর মতো এক বাল্যবিধবাকে বিবাহ করে। সাহিত্য ও জীবনের এই বিরল সামঞ্জস্যই প্রেমচন্দকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই উপন্যাসের আর-একটি বড় প্রাপ্তি শিবরানী দেবীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা। তিনি শুধু প্রেমচন্দের সহধর্মিণী নন, নিজেও ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। সংসার, স্বামী ও সাহিত্য – এই তিনের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন, লেখক তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে শিবরানী দেবীর ব্যক্তিত্বও পাঠকের কাছে সমান উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

উপন্যাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যও স্থান পেয়েছে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময়কার ঘটনাবলি, সেই কমিটিতে জওহরলাল নেহরুর পাশাপাশি প্রেমচন্দের সদস্যপদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে তাঁর গভীর অনুরাগী হয়ে ওঠার কাহিনি – এসব তথ্য উপন্যাসটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি

প্রেমচন্দের বহু বিখ্যাত উপন্যাসের রচনাপটভূমি সম্পর্কেও এমন কিছু আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে, যা পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করবে।

তবে এই উপন্যাস শুধু প্রেমচন্দ ও শিবরানী দেবীর জীবনগাথা নয়; এটি এক অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস। শিল্পী ও শিল্পের চিরন্তন লড়াই, আদর্শ ও বাস্তবতার সংঘাত, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার গল্প – সব মিলিয়ে এটি এক অনন্য সময়ের দলিল।

প্রতিকূলতার পর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কীভাবে একজন মানুষ মেরুদণ্ড সোজা রেখে বেঁচে থাকেন, কীভাবে শিল্পচর্চা ও মানবসেবার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা তাঁকে অটল রাখে – এই উপন্যাস তারই অনুপ্রেরণাদায়ক দলিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রেমচন্দ ও শিবরানী দেবীর অবস্থান, তাঁদের সমাজসচেতন মন, সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা – সব মিলিয়ে তাঁরা কখনও খ্যাতির মোহে নিজেদের হারিয়ে ফেলেননি। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুস্থ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের, আর তাঁদের সাহিত্য সেই স্বপ্নেরই প্রতিফলন।

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় – কর্মসূত্রে একাউন্টেন্ট, অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে ৩০ বছরের বাস। বাংলা সাহিত্য তার প্রাণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় টান এবং ভালবাসা। এছাড়া নাটক, গান শোনা ও কবিতা পড়ে অবসর কাটান। একজন আদ্যপ্রান্ত রোমান্টিক মানুষ। আড্ডা মারতে ভালবাসেন।

বাতায়নে প্রকাশিত বই

সোনাঝুরি

আমাদের জীবন স্বাদ, বর্ণ গন্ধ আর স্পর্শের বৈচিত্র্যে ভরপুর। কখনো সেখানে উপচে পড়ে কুসুম কুসুম নরম রোদের পেয়ালা। কখনো সেখানে বেজে ওঠে টুং টাং জলতরঙ্গের স্বর। কখনো আবার জীবনের স্বাদ "রেনবো কালারের আইসক্রিম" এর মতো। এই বইয়ের গল্পে ধরা পড়েছে জীবনের স্ন্যাপসট। গল্পের পটভূমি কখনো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, কখনো কুইন্সল্যান্ড, কখনো কলকাতা। এ বইতে একটা সুতো হল শিকড়ের প্রতি টান, আর অন্যসুতো প্রবাসজীবনের প্রকৃতি ও সমাজ। এই দুইসুতোর বুনুনিতে ফুটে উঠেছে জীবনের রকমারি নকশা। সহজ ভাষায় এক নিরন্তর এক অনুসন্ধান।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

করুণার মত ঘরবাড়ি

তপনজ্যোতির মিত্রের গল্পগ্রন্থ **"করুণার মত ঘরবাড়ি"**
– সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্রের কথামুখ

তপনজ্যোতি মূলত কবি। এইটি তাঁর গল্পের বই, কিন্তু কবিতার সীমারেখা পেরিয়ে তা গল্প। কবিতা হতে হতে দিক পরিবর্তন করে গল্প। গল্পের উপাদান আছে, আবার লেখার গুণে তা অন্য পথে গেছে। এই বই পড়া মানে গল্পের এক নতুন দিকের খোঁজ পেয়ে যাওয়া।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে তার বাস। বহুদূরে তার জন্মভূমি। সে সেই জন্মভূমি জননীর কথাই লিখে যায়। এইসব গল্প, কবিতা কি ডায়াস্পোরিক সাহিত্য বলে আলাদা? আমার তা মনে হয়নি। ইউনিভারসাল ট্রুথ যা, জাগতিক সত্য, তপনজ্যোতির লেখা গল্প পড়লে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এনসব গল্প খুবই ব্যক্তিগত উচ্চারণ। সাহিত্য সেই উচ্চারণেই তার ধর্ম ধরে রাখতে পারে। তপনজ্যোতির গল্প তা ধরে রেখেছে।

প্রথম পড়া "মায়ের জ্যোৎস্না" – তা গল্প সত্য, কিন্তু লেখা হয়েছে যেন কবিতা করে। খুবই ব্যক্তিগত উচ্চারণ। প্রতিটি পংক্তিই যেন কাব্য সুষমায় ভরা।

"আমিই অনুপম" গল্পটি আয়তনে খুবই ছোট, একে বর্তমানে অণুগল্প বলা হয়, কিন্তু এ একটি গল্পই। তবে অণু পরিমান নয়। সামান্য পরিসরে এই গল্পের ব্যাপ্তি অনেক।

এমনও মনে হয়েছে, তপনজ্যোতি এক একটি গল্পের খণ্ডাংশ লিখেছেন। একটি অনুচ্ছেদ লিখে বাকিটা পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর আধুনিকতা। তিনি যতটা বলেন, ততটাই না বলেন। "ভালোবাসা", "অন্নের দেবী", "এক অমলের কাহিনি" সেই পথেই গেছে। তাঁর মিত এবং স্নিগ্ধ উচ্চারণ গল্পকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

"চন্দ্র সূর্যের গল্প" – এই গল্পটি চন্দ্র এবং সূর্যের কথোপকথনের ভিতরে উন্মোচিত। তপনজ্যোতি দুটি উটের কথা বলেছেন। তারাই চন্দ্র সূর্য। তারা সওয়ারি নেয়। সওয়ারির কাহিনি নিজেরা পরস্পরকে বলে। ভারি সুন্দর উপলব্ধি। মহাবিশ্বের নিকটে আমরা কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই না।

আর এক গল্প, "একটি কান্নার কাহিনি"। মা দুর্গা অসুর নিধনে বছর বছর মর্ত্যে এসে ক্লান্ত। আর আসবেন না। যাওয়ার সময় দেখেন এক শীর্ণকায়, সব হারানো মানুষ তাঁর সমুখে প্রণিপাত। সে কী চায়? গল্পটির আয়তন সামান্য, কিন্তু আবেদনে বিশাল।

এই গ্রন্থে আছে "আলো-আঁধারির ছায়াপথ" নামের একটি আত্মবিস্ফোরণের কাহিনি। এ গল্প অপূর্ব। মনে দাগ কেটে যায়। প্রেম, এই জীবন, জীবনের আরম্ভ আর অন্তিমতা, বড় কষ্ট আর জীবনের আলোয় ভরে উঠতে চাওয়া গল্প লিখেছেন তপনজ্যোতি।

অপূর্ব এক অনুভূতির গল্প "গানের ভুবন"। "বিস্ময়গ্রহ" গল্পে আছে এই পৃথিবীর আত্মধ্বংসের উচ্চারণ।

গ্রন্থ নামের গল্প, "করুণার মত ঘরবাড়ি"। বহমান জীবনের গল্প। স্নিগ্ধ, আবেগে কম্পিত এই গল্প। একেবারেই অন্য স্বাদ। "বসন্তের জলাশয়ের প্রতিচ্ছবি" গল্প যুদ্ধবিরোধী কথা নিয়ে এসেছে। নতুন প্রজন্ম চায় না যুদ্ধ।

তপনজ্যোতির লেখার গুণে সামান্য কথাই গল্পের কথা হয়ে ওঠে। কবিতা গানের ভিতর দিয়ে এই জীবন নদী বয়ে যায়। সেই বহমানতাই তাঁর দর্শন। নির্বাসিত এক কবি এবং নির্বাসিত রাজার কাহিনিও লিখেছেন তিনি। সব কাহিনি একেক সময় অলৌকিক হয়ে ওঠে, ইচ্ছাপূরণের পথে গিয়েও গল্পের ভারসাম্য বজায় রাখে।

আমি সব গল্পের কথা বলিনি। সব গল্পই তপনজ্যোতির গল্প। তার চেতনার গল্প। তার স্বপ্ন-স্মৃতির গল্প।

পঞ্চাশ বছর বাদে বন্ধুর বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে ভাবছি এও জীবন! হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে সব। জীবন যে মহাসমুদ্র। তা না হয়ে হবে কী?

পার্থে বাতায়ন পত্রিকার “সত্যজিৎ রায়” সংখ্যার বই প্রকাশ করলেন সন্দীপ রায় মহাশয়

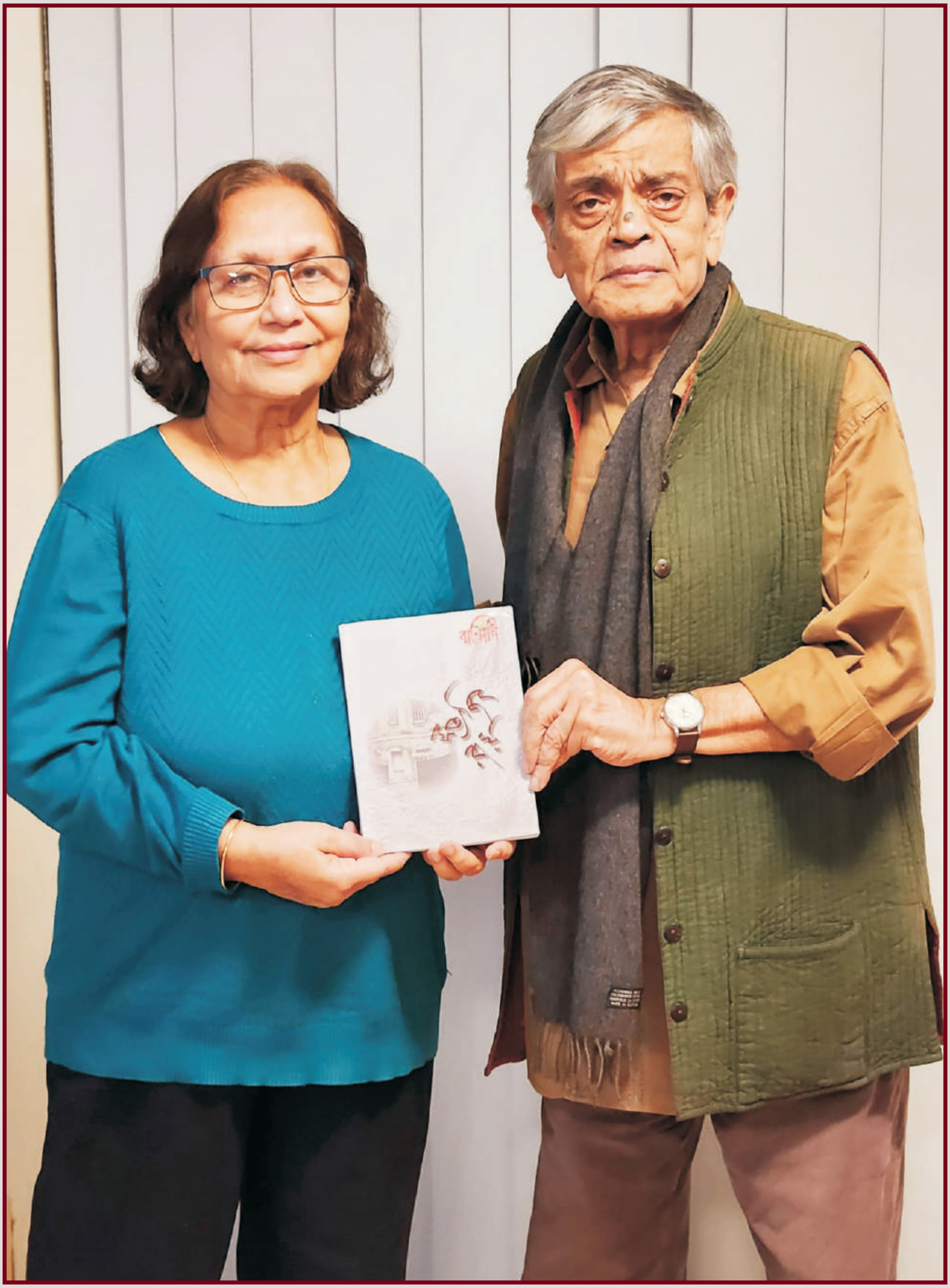

ISBN 978-1-7641232-6-6